
মনের মিল
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
SAILESH PAUL

দেব-সাহিত্য-কুটীর
২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত



১৩৫১

দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
এস্, সি, মজুমদার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

দুই টাকা

उपहार





মনের মিল



প্রথম পরিচ্ছেদ

ফুলছড়ি

কলিকাতার দক্ষিণে গঙ্গার তীরে ছোটগ্রাম···ফুলছড়ি। গ্রামখানি ছোট হইলে কি হয়, গ্রামের মধ্যে দলাদলি, দ্বেষ-হিংসার মাত্রা এমন প্রবল যে, অনেক বড়-বড় বৰ্দ্ধিষ্ণু গ্রামও এ ব্যাপারে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না!

পাড়ায়-পাড়ায় স্বতন্ত্র দল। দলপতির প্রখর দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ উদ্যত,—কোথায়

কি ত্রুটি ঘটিল, কার পাণ হইতে কতটুকু চূণ খশিল, সেই দিকে! বাঁধা আইন-কানুন, বাঁধা গণ্ডী এমন টানা যে, তার বাহিরে কাহারো পা পড়িলে সর্ব্বনাশ! লাঞ্ছনা-তিরস্কারের অন্ত থাকে না। গ্রামে মুখ-দেখানো ভার হইয়া ওঠে এবং দলপতির নির্দ্দেশ-মত প্রায়শ্চিত্ত করিলে তবেই সে-যাত্রা রক্ষা!

অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ পাড়ায় একটা-না-একটা বিষয়ের ঘোঁট চলিয়াছে! ও-পাড়ার শশী চক্রবর্ত্তীর বিধবা ভাজ গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া মুখের ঘোমটা খুলিয়া চরণ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে নাকি কথা কহিয়াছে! গ্রামের বৌ হইয়া এতখানি তার নির্লজ্জ আচরণ! অমনি শশী চক্রবর্ত্তীর নামে দলপতির পরোয়ানা জাহির হইল,—করাও বারোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন! নহিলে একঘরে হইতে হইবে! চরণ ভট্টাচার্য্যকে এ-সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করিতে শুনা গেল না।

শশী এই সেদিন ভাইয়ের অসুখে ডাক্তারের জন্য নগদ একশোটি টাকা ধার করিয়াও ভাইকে ধরিয়া ইহলোকে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই! পাড়ার সবার ঘরে ভিটার দলিল লইয়া গিয়াও তার জোরে টাকা ধার পায় নাই। বিধু মুখুয্যে টাকার আণ্ডিল। এত-বড় নির্লজ্জ সুদখোর যে তার আর জোড়া নাই! সে বলিয়া বসিল, দলিল লেখাপড়া এবং রেজিষ্ট্রী না হইলে সে টাকা দিতে পারিবে না। তা ছাড়া সুদের যে-হার শশী বলিয়াছে, তা একেবারে অচল, দুঃসাধ্য ব্যাপার! বিধু মুখুয্যে সুদের যে-

হার বলিল, শশীর পক্ষে সে-সুদে টাকা ধার লইলে ভিটা বাঁচানো কোনোকালে সম্ভব হইবে না।

গৃহে ভাইয়ের প্রাণ তখন দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে ছটফট করিতেছে—তাহার পাশ ছাড়িয়া নড়া চলে না! সুদ না হয় খুব চড়া দিলাম, ভিটা না হয় গেল, ভাইয়ের প্রাণের চেয়ে ভিটার দাম বেশী নয়! কিন্তু রেজিষ্ট্রী-অফিসে ছোটা তো সহজ ব্যাপার নয়! সেখানে দলিল রেজিষ্ট্রী হইলে টাকা মিলিবে—তবে সেই টাকায় ঔষধ-পথ্য! দাদা অনেকের দায়ে মাথা দিয়াছে! পয়সার অভাবে সেই দাদা বিনা-চিকিৎসায় প্রাণ দিবে? বিধু মুখুয্যের দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া, দলিল লইয়া শশী বেচারা শেষে এক পেশোয়ার-বাসী কাবুলীর দ্বারস্থ হইয়া টাকা ধার করিয়া, ডাক্তারের পায়ে ধরিয়া দক্ষিণা দেয়! সে টাকা শোধ দেওয়া দূরের কথা, কাবুলীর পাগড়ি আর ঢিলা আলখাল্লা ঘুমে-জাগরণে তার আশে-পাশে ছায়ার মতো কি বিভীষিকার মূর্ত্তি ধরিয়া যে সারাক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিতেছে—আজও সে-ছায়া সরে নাই! এরা বলে কি না, বারোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন করাও! তাও বিনা দোষে!

শশী খিঁচাইয়া উঠিল, বলিল—কভি নেহি! দাম্ড়া গরুকে হাম্ জাব্ নেহি খিলায়েঙ্গা!

বিধবা ভ্রাতৃজায়া বিন্দু স্বামী-বিয়োগের সদ্য বেদনার উপর লজ্জার বোঝা মাথায় বহিয়া বলিল—ওঁদের মিছে কথা! চরণ ভট্চায এমন ইতর রসিকতা করেছিল···তার জবাবে ধম্‌কে

আমি বলেছিলুম—বুড়োর ঐ মুখ ঝাঁটার ঘায়ে থেঁতো করে' দিতে পারতুম তো ঠিক হতো!···ব্যাপার ভাই, এই!

শশী বলিল—চরণ ব্যাটা হলো আবার সদু বাঁড়ুয্যের ইয়ার। ব্যাটা ভট্‌চায্যি, না, চামার! দু-ব্যাটার ভেতরের কথা জানি তো! মগের মুল্লুক পেয়েচে! ইঃ, না? ইংরেজের রাজত্ব, এখানে চোখ রাঙাস্ কি সাহসে? কক্‌খনো বামুন খাওয়াবো না আমি! কেন, কিসের জন্য? তাও ঐ সব চামার বামুন!

বিন্দু কহিল—কিন্তু ঠাকুরপো, ইংরেজের রাজত্ব হলেও এরাই এ মুল্লুকের বিধাতা।

শশী কহিল,—তুমি ভেবো না বৌঠাকরুণ, কোনো দায়ে কোনো ব্যাটা কখনো মাথা দিতে আসে না—শুধু ঘরে বসে' হুম্‌কি ছাড়বে! কে রাখে ওদের তোয়াক্কা?

বিন্দু কহিল—ওরা একঘরে করবে, বলেচে!

শশী কহিল—বেঁচে যাবো। কোনো ব্যাটাকে বাড়ীতে ডাকতে হবে না! কোনো ব্যাটা ছেলের বিয়েয়, ভাতে, পৈতেয়, দু'খানা কাঁচা ময়দার লুচি দেখিয়ে দু'টাকা চার টাকা লৌকিকতা আদায় করতে পারবে না আর!

ভ্রাতৃজায়া কহিল,—তোমার দায়ে-অদায়ে···

শশী কহিল—কোনো ব্যাটা কোনোদিন দেখেচে? দেখবে, তাও আমি চাইনে! তবে আমিও ছাড়চি না। আমার মায়ের

মত বড় ভাজ তুমি···তোমার নামে এত-বড় মিথ্যা অপবাদ তুলেচে যে ব্যাটা, তাকে আমি একবার দেখে নেবো।

বিন্দু কহিল—তার মানে ?

শশী কহিল,—মানে এখনও খতিয়ে দেখিনি বৌঠাকরুণ··· তবে সে-মানে যত ঘোরালোই হোক্, আমি ছেড়ে দেবো না।

বিন্দু গম্ভীর স্বরে ডাকিল,—ঠাকুরপো···

সে-ডাকে আসন্ন বিপদের আশঙ্কা, এবং তার পিছনে কতখানি স্নেহের মাধুর্য্য যে মিশানো!

শশী কহিল,—তোমার কোনো ভয় নেই, বৌঠাকরুণ। গাঁয়ে একটা মজা দেখচি বেশ, যার পয়সার জোর আছে, সে যা-খুশি তাই করে' যাচ্ছে—দুর্ব্বল গরীবের উপরই শুধু যত জুলুম!

বিন্দুর চোখে নিরুপায়তার ছায়া আরো গাঢ় হইল। বিন্দু কহিল,—তবে ?···তোমার তো পয়সার জোর নেই, লোক-বলও নেই! কাজেই···

শশী কহিল,—কাজেই, ওদের হুঙ্কার মেনে চলতে হবে? বারোটা মর্কটকে পাত পেতে খাওয়াবো ?

বিন্দু শান্ত স্বরে কহিল,—তা নয় ভাই ঠাকুরপো···আমাকে নিয়েই তো কথা উঠেচে। আমি যদি এ ভিটে ত্যাগ করে' যাই ?

—বৌঠাকরুণ···

শশীর কথায় বাধা দিয়া ভ্রাতৃজায়া কহিল—জানি ভাই, এ ঘর ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে কত শক্ত! এ ঘর আমার···

বেদনার-বাষ্পে ভ্রাতৃজায়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

শশীর বুকে এইটুকুই অনেকখানি আঘাতের বেদনা জাগাইয়া তুলিল। শশী কহিল,—এমনি অকথ্য অপবাদ মাথায় বয়ে তুমি চলে যবে?...তা হবে না বৌঠাকরুণ...আমি মরদ-বাচ্ছা। ঐ ভট্চায্যি বামুনকে আমি একবার তার টিকি আর নামাবলীর খোলোস ছাড়িয়ে সকলের চোখের সামনে ধরে' দেবো,—এই আমার পণ!...তোমার কোথাও যাওয়া হবে না। ওদেরো কথা শুনবো না! ওরা কি করবে? কত শক্তি?...ওদের সঙ্গে মিশে পাঁচ-ঘরের ঘর আমি করতে চাই না। ডোম-চাঁড়ালের দোরে দাঁড়াবো দরকার হলে'—তবু ও ইল্লৎদের ঘেঁষ কখনো সইবো না।

আলোচনায় দেবরের জিদ আরো বাড়িবে...কি করিতে শেষে কি করিবে,—এই ভাবিয়া বিন্দু চুপ করিল।

শশী তখন ঘরের মধ্যে ঢুকিল এবং কাঁধে একখানা উড়ানি ফেলিয়া একটা ছাতা লইয়া ঘরের বাহিরে আসিতে বিন্দু কহিল,—কোথায় বেরুনো হচ্ছে, শুনি? বেলা এই বেড়ে উঠলো, আর এখন তোমার বেরুবার সময়! তারপর কোন্ অবেলায় ফিরে কড়কড়ে ভাতগুলো খেতে বস্‌বে! তার চেয়ে বাবু, স্নান করে' খাও। আমি এখনি ভাত ধরে' দিচ্ছি। বেরুতে হয়, খেয়ে বেরিয়ো।

হাসিয়া শশী কহিল,—তুমিও যেমন! বেশী দূর নয়, আমি যাচ্ছি ও-পাড়ায় নিতাইয়ের কাছে। এখনি ফিরবো।

বিন্দু কহিল,—তোমার ফেরা তো! বেরুলে কি আর তোমার ঘরের কথা মনে থাকে, ভাই?

বিন্দু থামিল, পরে হাসিয়া কহিল,—ঐ জন্যই তো বলি, একটি বৌ এনে দি, নাহলে' ঘরে মন বসবে কেন?

শশী ফিরিয়া বিন্দুর পানে চাহিল, কহিল,—ও-কথা পুরোনো হয়ে গেছে, বৌঠাকরুণ। তোমার ভয় নেই, আমি এখনি ফিরবো আর ফিরে শীগ্‌গির করেই নেয়ে-খেয়ে নেবো। কেন না, আমাদের মস্ত একটা কাজ আছে। তার কিনারা কতদূর হলো জানতে চলেছি।

বিন্দু কহিল,—কাজটা কি, শুনি?

শশী কহিল,—মাছ ধরা গো, মাছ ধরা।

বিন্দু আর কোনো কথা কহিল না; শশীও ছাতা খুলিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

নিতাইয়ের বাড়ী ও-পাড়ায়! সেখানে যাইতে হইলে সতু বাঁড়ুয্যের বাড়ী পার হইতে হয়। শশী আসিয়া সতু বাঁড়ুয্যের বাড়ীর সামনে পৌঁছিলে দেখিল, চরণ ভট্টাচার্য্য মহা উৎসাহে হাত নাড়িতে-নাড়িতে সতুর বাড়ী হইতে বাহিরে আসিতেছে। সঙ্গে আছে আরো টাক-মাথা তিন-চারিটা সমাজ-রক্ষী।

চরণকে দেখিবামাত্র শশীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। শশীকে দেখিয়া চরণ কহিল—এই যে শশী! তারপর, ব্রাহ্মণ-ভোজনটা কবে হচ্ছে হে?

শশী কহিল,—যেদিনই হোক্, তোমার তো কোনো আশা দেখচিনে···

চরণ কহিল—তার মানে ?

শশী কহিল—তোমার মতো বিট্‌লেকে তো ব্রাহ্মণের দলে ডাকতে পারি না। অন্ততঃ আমার বাড়ীতে। পাড়ার বাগ্‌দীদের যদি কখনো নেমন্তন্ন করি, তাহলে সেদিন তোমায় ডাকবো।

রাগে বাক্য-হারা হইয়া চরণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শশীর পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শশী কহিল—তোমাকে খাওয়ানোর চেয়ে তুটো ভেড়া-গরু খাওয়ালে অনেক বেশী পুণ্যি হবে।

এ-কথায় চরণ দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। চোখে আগুন জ্বালিয়া চরণ কহিল,—ভারী তেজ দেখচি যে। চরণকে চেনো না? চরণ যদি মনে করে তো ও-তেজ কোথায় থাকে, একবার দেখি।

শশী কহিল,—যেখানেই থাকুক, অন্ততঃ তুলে-পাড়ায় কি বাগ্‌দীপাড়ায় তাকে পাবে না চরণচাঁদ ভট্‌চাজ!···কথাটা বলিয়া চরণের উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া শশী চলিয়া গেল।

কথাটার মধ্যে অনেকখানি ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন ছিল। তুলে-পাড়ার সঙ্গে না হোক, বাগ্‌দীপাড়ার সঙ্গে চরণের একটু সম্পর্ক আছে। প্রায়ই তাহাকে সে পাড়ায় দেখা যায়। কাহাকেও দেখিলে চরণ বলে—এই সতু-বাবুর পাওনা আদায় করতে আমার আসা।

অর্থাৎ বাগ্‌দী-পাড়ায় সতুর কয়েক ঘর প্রজা আছে। তাদের কাছ হইতে খাজনা আদায়ের অন্য লোক থাকিলেও এ-কাজটায় চরণ অগ্রসর হইয়া আসে। এজন্য গোপন অন্তরালে কেহ-কেহ বাগ্দী-পাড়ায় কোনো একটি বিশেষ পরিবারের সহিত চরণের ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত করে। তবে সমাজে সতু বাঁড়ুয্যের প্রতিপত্তি বিলক্ষণ এবং চরণ তাঁর বিশেষ অনুগৃহীত—এই দুই কারণে ব্যাপারটা লইয়া প্রকাশ্যে ইহার বেশী আলোচনা করিতে কাহারো সাহসে কুলায় না! কে জানে, এখানে ছোট একটি ইঁট ছুঁড়িলে কত-বড় পাটকেল কোন্ দিক্ হইতে আসিয়া মাথায় পড়িবে!

আজ শশীর এ প্রকাশ্য ইঙ্গিতে চরণ একটু চমকাইয়া উঠিল; পরক্ষণেই নিজেকে সম্বরণ করিয়া কহিল—টাকা আদায় করতেই যাই বাগ্দী-পাড়ায়! তাতে হয়েচে কি? গঙ্গা-স্নান না করে' জল গ্রহণ করি না আমি। সন্ধ্যা-আহ্নিক, এমন নিষ্ঠা···গ্রামে আর কার আছে, দেখিয়ে দিক্ না! ফক্কড় ছোকরা, আমার সঙ্গে মস্করা করে! আমার উপর ঠেশ্ দিয়ে গ্রামে বাস করবে ঐ বিধবা কাঁচা-বয়েসী ভাজ নিয়ে! দ্যাখো মজা, কি হাল করি তোমার!···

কিন্তু নিস্ফল আক্রোশ! যাহার উদ্দেশে এ আক্রোশ, সে তখন বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। চরণ একবার পথের দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর গভীর একটা অভিসন্ধি মনে-মনে আঁচিয়া লইয়া আবার সদু বাঁড়ুয্যের গৃহে

প্রবেশ করিল। বাকী সমাজ-রক্ষীর দল স্নানাদির বেলা হইতেছে বলিয়া বিদায় লইল। বিদায় লইবার সময় দেবু বলিয়া গেল,—যা হয় একটা ঠিক করে' ফ্যালো। এসব সামাজিক ব্যাপারে গয়ং-গচ্ছ করতে নেই হে চরণ।

চরণ কহিল,—না, আজই হেস্ত-নেস্ত না করে' নড়্‌চি না!...

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিতাই

নিতাইয়ের গৃহে নিতাই ক'টা হাঁসের পালক হইতে ফাৎনা কাটিয়া ছিপে বাঁধিতেছে, এমন সময় বাহির হইতে শশী ডাকিল,—নিতাই আছো ?

—কে ? শশীদা···এসো !

নিতাইয়ের গৃহে সে ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নাই, কাজেই তার দ্বার সর্ব্বক্ষণ অবারিত ! নিতাইয়ের গৃহে গিয়া শশী কহিল,—বেরুবার আয়োজন পাকা তো ?

নিতাই কহিল,—নিশ্চয়। তবে যাবার সময় একবার বাগ্দীপাড়া ঘুরে যেতে হবে, দাদা।

—বাগ্দীপাড়া ?

নিতাই কহিল,—হ্যাঁ। উমেশের এক ভাইপো আপিসে ছুটি নিয়ে এসেচে। তার শরীর খারাপ, এখনো সারতে পারে নি। বজবজের একটা পাটকলে সে কাজ করে। তার ছুটি বাড়ানোর দরখাস্ত একখানা লিখে দিয়ে যেতে হবে। নাহলে চাকরি খোয়াতে পারে, কিম্বা জরিমানা হতে পারে ! বেচারা !

শশী কহিল,—আমাদের কতদূর যেতে হবে, শুনি ?

নিতাই কহিল,—নতুনপাড়ায়। ঐ পাদ্রী-সাহেবদের নতুন ইস্কুল হয়েছে না ? তার ঠিক পিছনে আব্দুলের পুকুর—মস্ত পুকুর দাদা, আর মাছ তাতে দেদার। ধরে' সুখ পাবে !

শশী কহিল,—বাগ্দীপাড়া ঘুরে যেতে একটু দূর পড়বে না ?

নিতাই কহিল,—কতটুকু বা ! তেমনি আষাঢ়ের বেলা ! অন্ধকার হতে যার নাম তোমার সাতটা। কত মাছ ধরবে, ধরো। এই আধ ঘণ্টা আগে দলু এসেছিল, বেচারী মিনতি জানিয়ে গেছে। তখনি লিখে দিতুম—কাজ ঢুকে যেতো। কিন্তু সে ওদের সাহেবের আর আপিসের নাম-লেখা কাগজটা বাড়ীতে ফেলে এসেচে। বললুম, সেই তো বেরুচ্ছি খানিক পরে, যাবার সময় লিখে দিয়ে যাবো।—তা তোমার ভয় নেই, দাদা। তোমাকে তাদের বাড়ী ঢুকতে হবে না, পাশে দাঁড়িয়ে থেকো ! তোমায় জানি তো, বামুন মানুষ, তায় ভট্চায্যি বামুন···বাগ্দীর ছায়া মাড়ালে জাত যাবে।

শশী কহিল,—আমি তাহলে নাওয়া-খাওয়া সেরেই তোমার এখানে আসবো। কি বলো ? তোমার কত দেরী এদিকে ?

নিতাই কহিল,—রান্না হয়ে গেছে।···

শশী কহিল,—দেখি, ছিপ কেমন হলো।

নিতাই কহিল,—তোমারটা হয়ে গেছে, ঘরে আছে। আনাই। আমার এতে হুইলটা লাগিয়ে নিলেই ব্যস্।

এ কথা বলিয়া নিতাই ডাকিল,—কাশি···

সে আহ্বানে দশ বছরের একটি ছেলে আসিয়া দাঁড়াইল। নিতাই কহিল—আমার ঘরের কোণে যে-ছিপটা তৈরী করে' রেখেচি, নিয়ে আয় তো ভাই···

কাশি ছিপ আনিতে গেলে শশী কহিল,—এ ছেলেটিকে কৈ আগে দেখিনি তো!

নিতাই কহিল,—না। ও এই দিনকতক হলো এসেচে। এইখানেই আছে আমার কাছে। দুনিয়ায় ওর কেউ কোথাও নেই। ওর আসল নাম হলো কাশিম—জাতে মুসলমান।

মুসলমান! শশীর আজন্মের সংস্কার একবার মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই এতটুকু হইয়া গেল! নিতাইয়ের কেহ কোথাও নাই, সে গোঁয়ার-গোবিন্দ! কিন্তু শশীর? তার গৃহে ভাজ আছে, বিগ্রহ আছেন। তাছাড়া সমাজ···যে-সমাজকে এই মাত্র প্রবল হুঙ্কারে-গর্জ্জনে সে তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছে! যত তুচ্ছ করুক, তবু সমাজ নামটার সঙ্গে কতখানি বিভীষিকা জড়ানো আছে! সমাজকে চক্ষে না দেখিলেও সে-বিভীষিকাটুকুকে প্রাণের কোণ হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতে পারে নাই! চট্ করিয়া সে কোনো জবাব দিতে পারিল না।

নিতাই কহিল,—আমাদের বোটের মাঝি ছিল হানিফ,—ও সেই হানিফের ছেলে। হানিফের বৌ তো অনেক দিন আগে মারা গেছে! হানিফও এক-বছর ধরে' কালা-জ্বরে ভুগে-ভুগে সেদিন মারা গেল। রোগে পড়ে' অবধি এই ছেলের জন্য ভেবে সে সারা হয়ে থাকতো। জাত-কুটুম কেউ এ-গাঁয়ে নেই। মারা

যাবার সময় কাশিমকে আমার হাতে দিয়ে যায়। যাবার সময় বলে, দাদাবাবু, এটাকে মানুষ করে' দিয়ো!

নিতাই একটা নিশ্বাস ফেলিল, তারপর হাসিয়া কহিল,—মানুষ কাকে বলে, জানি না! নিজেও মানুষ হলুম না কোনো দিন ··আমি একে কি করে' মানুষ করি, বলো তো দাদা? যাক্, খেতে পরতে দিতে পারবো। তারপর ওর নিজের হাত, মানুষ হওয়া।

কাশি ওরফে কাশিম ছিপ লইয়া আসিলে নিতাই কহিল,—এই তোমার ছিপ।

ছিপ তো আসিয়াছে! কিন্তু ঐ মুসলমানের হাত হইতে সে ছিপ লওয়া! কেমন এক অশুচিতায় শশীর মনটা রী-রী করিয়া উঠিল। এমন অনাচার! নিতাই বুঝিল, বুঝিয়া কহিল, —ছুঁতে পারচো না! গঙ্গাজল চাই না কি? বলো···এনে দি!

নিতাই উঠিয়া ঘর হইতে গঙ্গাজল আনিয়া ছিপ লইয়া সেটাতে গঙ্গাজল ছিটাইল, পরে কহিল,—এবার হয়েচে? খাশা চীজ বানিয়ে রেখেচো দাদা এই গঙ্গাজল! একটু ছুঁলেই শুদ্ধি! খুন-খারাপী ছাড়া আর যা-কিছু করো। খুন-খারাপীটাও চলতো, কিন্তু আইন-পুলিশের রাজ্য কি না! তাই ভাবি, গঙ্গাজল না থাক্‌লে সংসারের অর্দ্ধেক আনন্দ তো গয়াস্থাৎ করতে হতো! হাসি পায় মোদ্দা এই ভেবে দাদা যে, সব মানুষকে এক বিধাতাই সৃষ্টি করেচেন! তিনি যদি প্রতি-হাতে গঙ্গা-জল ব্যবহার করতেন, তাহলে ভগীরথের কি সাধ্য থাকতো, মা-গঙ্গাকে

পৃথিবীতে আনেন !···মাঝে থেকে আমরাই শুধু কেউ মস্‌জিদ বানিয়ে, কেউ গঙ্গা-জল তৈরী করে' পৃথক হচ্ছি! কাশিমকে তৈরী করতে ভগবান কি অশুদ্ধ হয়ে গেছেন ?

কথাটা খুব সহজ। ইহাতে শাস্ত্রের হুঙ্কার নাই,—এবং শশীর মন সেটাকে গ্রহণ করিবার জন্য নিমেষে উন্মুখ হইয়া উঠিল। কিন্তু, সংস্কার! ঘরের বিগ্রহের কথা মনে পড়িয়া গেল। তাঁর মুখে বিরক্তির ঝাঁজ।···শশী কোনো জবাব না দিয়া ছিপটা পরীক্ষা করিল, তারপর নিতাইকে কহিল—তাহলে আমি চান, পূজো-আর্চ্চা, খাওয়া···সব সেরে এখনি আসচি। মোদ্দা, তুমিও তৈরী হয়ে নাও! ছিপটা এইখানেই থাকুক। কেন আর মিছে বয়ে নিয়ে যাই ? এই পথ দিয়েই তো যাবো!

শশী চলিয়া গেল। নিতাই ছিপের কাজ সারিয়া উঠিল—এবং মাথায় তেল লেপিয়া কাশিকে তেল মাখিতে বলিল। কাশির তেল মাখা হইলে তাকে লইয়া সে গেল নদীতে স্নান করিতে।

সারা পথ কাশির কথা ভাবিতে-ভাবিতে শশী গৃহে ফিরিল। বেচারা অনাথ! মুসলমানের ঘরে জন্মিয়াছে বলিয়া তার কি এমন অপরাধ হইয়াছে যে সে ভাসিয়া যাইবে ? তার যদি পীড়া হয়, ক্ষুধায় কাতর হইয়া সে যদি পথে পড়িয়া থাকে তো তাকে বুকে তুলিয়া ঘরে আনিয়া সেবায়-যত্নে আরাম করা···এটা বড়, না, জাত বাঁচাইয়া তার কাছ হইতে সরিয়া পড়াতেই মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায় ? কিন্তু, মুসলমান। গৃহে বিগ্রহ-পূজা করিতে হইবে!···মস্ত এক সমস্যা শশীর দ্বিধা-হীন নিশ্চিন্ত মনের মধ্যে

জাগিয়া এক বিশ্রী জোট পাকাইয়া তুলিল! নিতাই কেমন অবলীলায় ঐ মুসলমানের ছেলেকে গৃহে আনিয়া ঠাঁই দিয়াছে।

এ সমস্যার মীমাংসাই-বা কে করে? কাহাকে প্রশ্ন করিলেই-বা সমাধান মিলিবে?

গৃহে ফিরিতে বিন্দু কহিল,—কি ভাগ্যি! এর মধ্যে ফিরেচো!

শশী কহিল,—ফিরলুম। আমি স্নান করে' আসি। এসেই পূজা সেরে নেবো। তুমি দুটি ভাতের ব্যবস্থা করে' রাখো, বৌঠাকরুণ।

বিন্দু কহিল,—তুমি আগে এসো তো। ভাত না পাও, তখন বলো।

শশী আর কালক্ষেপ না করিয়া স্নানে বাহির হইল। স্নানান্তে পূজা সারিয়া আহারে বসিলে বিন্দু কহিল,—কোথায় যেতে হবে, শুনি?

শশী কহিল,—মাছ ধরতে···বলেচি তো!

বিন্দু কহিল,—ধন্যি সখ যা হোক! মাছ ধরে' নিজে তো খাবে কত! কতকগুলো মাছ ধরে' একে-তাকে বিলিয়ে কি-সুখ পাও, জানি না ভাই!

হাসিয়া শশী কহিল—বিলুনোতে আসল সুখ নয় বৌ-ঠাকরুণ, আসল সুখ, মাছ ধরায়। ফাৎনার পানে চেয়ে যে বসে' থাকি, লোকে হাসে—কি রাজ্য-জয়ের ফন্দী আঁাচছি! তারপর যখন একটি টানে পাঁচসেরের মাছটাকে ডাঙ্গায় তুলি, তখনকার

আনন্দ…ওঃ, রাজা রাজ্য জয় করে' এসেও বুঝি এমন আনন্দ পায় না!

বিন্দু হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তা অনর্থক এ প্রাণিহত্যায় আনন্দ পাওয়া কি ভালো, ঠাকুরপো? জলের মাছ, জলেই থাক্ না, বাপু…

শশী কহিল,—ক্ষেপেচো বৌঠাকরুণ, জলের মাছ জলে থাকবে যদি তো ছিপটার সৃষ্টি হয়েছে কেন?

হাসিয়া বিন্দু কহিল,—শোনো কথা! ছিপের জন্য মাছ, না, মাছের জন্য ছিপের সৃষ্টি!

শশী কহিল,—মন্দ বলো নি বৌঠাকরুণ! এমনি একটা কথাই এই কিছুক্ষণ থেকে আমার মনে জাগচে। সে-কথা হলো এই যে, সমাজের জন্য মানুষ, না, মানুষের জন্য সমাজ!

বিন্দু কহিল,—ইস্, তুমি যে একেবারে আধ্যাত্মিক হয়ে উঠলে!

শশী কহিল,—আমাদের ও-পাড়ার নিতাইকে জানো তো?

বিন্দু কহিল,—শ্রীধর চাটুয্যের ছেলে?

শশী কহিল,—হ্যাঁ। তা সে তো একা মানুষ। আজ তার ওখানে গিয়ে দেখি, দশ-এগারো বছরের একটি মুসলমান ছেলেকে সে ঘরে এনে ঠাঁই দেছে। গোয়ালের ধারে পড়ে' থাকবার মতো ঠাঁই নয়, একেবারে নিজের ঘরের মধ্যে ঠাঁই। ছেলেটার মা-বাপ ভাই-বন্ধু কেউ কোথাও নেই যে তাকে মানুষ করে!

বিন্দু কহিল,—মুসলমানের ছেলে?

শশী কহিল,—হ্যাঁ গো! তাকে দেখে আমি তো চমকে উঠেছিলুম! ছেলেটির নাম, কাশিম। নিতাই তার নাম দেছে, কাশী। অর্থাৎ মুসলমানের 'ম' অক্ষরটা ছেঁটে দেছে। তাই ভাবছিলুম, আমাদের এই সদু বাঁড়ুয্যের দল যদি টের পায়, তাহলে খাপ্পা হয়ে উঠবে।

বিন্দু শিহরিয়া উঠিল, কহিল,—সত্যি ভাই! এরা জানলে মারধোর করতেও পারে বোধ হয়! নিতাই শুনেচি ভারী একরোখা ছেলে। নিজে যা ভালো বোঝে, তা করতে কারো চোখ-রাঙানির তোয়াক্কা রাখে না।

শশী কহিল,—ওই জন্যই তো ওকে আমি সবার চেয়ে ভালোবাসি।···ভাবছিলুম, আমাদের কথাটা ওকে নাহয় বলি···

এ-কথার মধ্যে নিজের প্রতি কতখানি ইতর গ্লানির ইঙ্গিত আছে, সেটুকু মনে করিয়া বিন্দু সসঙ্কোচে কহিল,—ঘরের কথা তার কাছে আর নাই-বা বললে ঠাকুরপো!

শশী কহিল, না, না, তুমি বোঝো না বৌঠাকরুণ···আমি একা আর তুমি মেয়েমানুষ—একজনকে পাশে সহায় পেলে আমার পক্ষে লড়া কত সহজ হয় ভাবো দিকিন! নিতাই কারো তোয়াক্কা রাখে না! ওকে বলি···তারপর দু'জনে মিলে ঐ চরণ ভট্টচায্যিটাকে একবার দেখে নি। ভারী পট্‌পটানি! ভেবেচে কী? একটা ছুঁচোর মোসাহেবি ক'রে বেঁচে আছে··· ওর তম্বি অসহ্য লাগে।

এই কথা বলিয়া, নিতাইয়ের গৃহের পথে কিছু পূর্ব্বে সহুর

বাড়ীর সম্মুখে চরণের সঙ্গে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল, সেটুকুও শশী বিন্দুর কাছে বিবৃত করিল, করিয়া কহিল,—ব্যাটা চামার! ওর বাগ্দীপাড়ার খাতাঞ্জিখানা আবিষ্কার করতে হবে।

এ-প্রসঙ্গে শশী আরও উত্তেজিত হইবে এবং সে উত্তেজনা যে তাকে কেন্দ্র করিয়াই বাড়িয়া উঠিবে, বিন্দুর তা নিঃসংশয়ে জানা ছিল। এ উত্তেজনা-প্রকাশে কোনো ফল নাই! মাঝে হইতে পাড়ায় বাস করার ব্যাপারে ক্রমে অশান্তি, আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তা জাগিতে পারে, ইহা ভাবিয়া ও-প্রসঙ্গে বাধা দিয়া বিন্দু কহিল,—তা, ও-ছেলেটিকে নিতাই পেলে কোথায়?

শশী কহিল,—বললে, তাদের এক বোটের মাঝি ছিল হানিফ—সেই হানিফের ছেলে। ছেলেটিকে দেখলে চট্ করে' মুসলমান বলে' ধরা যায় না।

হাসিয়া বিন্দু কহিল,—মুসলমান হলেই কি মানুষের চেহারা উল্টো রকমের হবে? এমন পাগলের কথাও তো শুনিনি।

শশী কহিল,—আচ্ছা বৌঠাকরুণ, ঐ মুসলমানকে যদি আমি ছুঁই?

বিন্দু কহিল,—তার মানে?

শশী কহিল,—তার গায়ে পড়ে' ছুঁতে যাচ্ছি না, অবশ্য। ধরো, দৈবাতের কথা। দৈবাৎ যদি ছুঁয়ে ফেলি?

এই অবধি বলিয়া শশী একবার থামিয়া বিন্দুর পানে চাহিল। বিন্দু কোনো জবাব না দিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শশীর পানে চাহিয়া

আছে দেখিয়া শশী আবার কহিল,—তাহলে আমায় গোবর-জলে ধুইয়ে সাফ করে' তবে বোধ হয় বাড়ীতে ঢুকতে দেবে তো ?

বিস্ময়ভরা স্বরে বিন্দু কহিল,—কেন ?

শশী কহিল,—নয় ? সে যে মুসলমান। তোমাদের শাস্ত্রে মুসলমানকে একদম তফাতে রাখতে বলে…

বিন্দু কহিল—আমি তো ভাই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নই, মুখ্যু মেয়েমানুষ। অত আচার-বিচারের মানেও আমি বুঝি না। মুসলমানকে যে-বিধাতা গড়েচেন, আমাকেও তো তিনিই গড়েচেন! না, বিধাতারও স্বধর্ম্ম-বিধর্ম্ম আছে ?

প্রচুর উৎসাহে শশী কহিল,—লাখ কথার এক কথা। ঠিক বলেচো বৌঠাকরুণ। নিতাইও তাই বলছিল। অর্থাৎ আমার ছিপগাছটা সেই ছোকরা ধরে' ছিল, সেটা ছুঁতে আমার কেমন বাধছিল। তাই নিতাই হেসে তাতে গঙ্গাজল ছিটিয়ে আমার হাতে দিলে, দিয়ে ঐ কথা বললে।… আমার কিন্তু এমন সংস্কার যে, এই সামান্য ব্যাপারে দ্বিধা বোধ করছিলুম। ভাবছিলুম, মুসলমানকে ছুঁয়ে বিগ্রহ পূজা করতে পারা যাবে না!

বিন্দু কহিল,—কেন ভাই, তোমার দাদার কথা মনে পড়ে না ? সেবার মুসলমান-পাড়ায় আগুন লেগে যখন সব পুড়ে ছাই হচ্ছিল, গাঁয়ের অত-সব মাতব্বর লোক দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল শুধু—তোমার দাদা থাকতে না পেরে ছুটে গিয়ে তাদের চালে উঠে চাল কেটে দেন্ ? কতকগুলো চালা তাতে বাঁচে। তারপর মোড়লরা তাঁকে কত টিটকিরী দেয়! শুনে

তিনি বলেন, টিকি রক্ষা করে' মানুষ মরচে দেখলে টিকির জাত যায় না? বটে! আর জাত যায় মানুষকে মরণের দোর থেকে হাত ধরে' টেনে বাঁচাতে গেলে, না? সেই অবধি সবাই তাঁকে তামাসা করতো, মৌলবী-ভট্চায্যি বলে'!

শশী কহিল,—তোমার কথা শুনে বাঁচলুম বৌঠাকরুণ। ঐ বিশ্রী সংস্কারটা আমার মনের সহজ ইচ্ছার উপর এমন চেপে বসেছিল যে, স্নান করতে গিয়েও তাকে সরাতে পারিনি! স্নান করতে-করতে কেবলি ভেবেছি, এই গঙ্গার অন্য-ঘাটে মুসলমান স্নান করচে হয়তো, তাতে কৈ গঙ্গার জাত যাচ্ছে না তো, আর সেই গঙ্গার জল এনে ঠাকুরের পূজাও তো করচি।

বিন্দু বহিল,—ঠাকুর সকলের মধ্যেই আছেন ভাই। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান, এসব ভেদ তো মানুষের মন-গড়া। ছোট ছেলেটি যখন জন্ম নেয়, তখন সে টিকি নিয়ে আসে না, কল্মা পড়েও আসে না। তার হাসি-খেলায় সব-ধর্ম্মের সব মানুষের প্রাণ গলে!

শশী কহিল,—মানুষ, মানুষ—এ ছাড়া তার অন্য পরিচয় নেই—এই কথাই খাঁটি। তার পর স্বভাবের গুণে কেউ হয় বড়, কেউ ছোট। ঐ যে চরণ ভট্চায্যি···তার চেয়ে এই মুসলমান কাশিমের দিকেই মন আমার ঝুঁকচে বৌঠাকরুণ!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিশন স্কুল

মস্ত পুকুর। দুই বন্ধুতে ছিপ ফেলিয়া ফাৎনার দিকে চাহিয়া তন্ময় হইয়া বসিয়া আছে। তিন ঘণ্টা ধরিয়া পণ্ডশ্রম সার হইয়াছে। নিতাইয়ের নির্দ্দেশ-মত কাশিম মাঝে-মাঝে জলে চার ফেলিয়া মৎস্য-গোষ্ঠীকে সবিশেষ প্রলুব্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছে। সে-বেচারীও বড় আশা করিয়া আসিয়াছে, কত-বড় মাছ উঠিবে! মাছ এ-পর্য্যন্ত উঠিল না দেখিয়া নিতাই বা শশীর চিত্ত অস্থির না হইলেও, ছেলে-মানুষ কাশিম নৈরাশ্যে শ্রান্ত হইয়া পড়িল। মাছ ধরার ব্যাপারে তার উৎসাহ ক্রমে শিথিল হইয়া আসিল। এক ফাঁকে সরিয়া আসিয়া সে পাদ্রীদের স্কুল-বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল।

মাঝারি সাইজের একতলা বাড়ী। ফ্লোরের উপর দুদিকে কাঠের রেলিঙ-আঁটা টানা বারান্দা, ঘরগুলি মাঝখানে। এই ঘরগুলিতে ছেলেরা পড়াশুনা করে। এই বাড়ীর পাশেই বাংলো-প্যাটার্ণের ছোট একটি বাড়ী—আশে-পাশে সম্মুখে-পিছনে অনেকখানি খোলা জায়গা। এই খোলা জায়গার একপ্রান্তে

ফ্লোরের উপর কতকগুলা ঘর। বোর্ডিং, ডিস্‌পেন্সারী, রান্নাবাড়ী এগুলো সেইদিকে। এই স্কুল-গৃহের সামনে একধারে পারালেল-বার, রিং, দোলনা প্রভৃতিতে সজ্জিত ক্রীড়াভূমি। আর এই স্কুল-গৃহ, বাংলো প্রভৃতি সমস্তটা একই কম্পাউণ্ডে তারের বেড়ায় ঘেরা।

খেলার মাঠে দশ-বারো জন ছেলে ছুটিয়া মহা-কলরবে খেলাধূলা করিতেছে। ছেলেদের বয়স সাত হইতে বারো বছর। কেহ দোল খাইতেছে, কেহ পারালেল-বারে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে,—এবং কয়েকটি ছোট ছেলে একটা ফুটবল লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। ইহাদের খেলাধূলার তদারক করিতেছে সুন্দরী এক কিশোরী বাঙালী। তার পরনে কালা পাড় শাড়ী, কাঁধে ব্রুচ আঁটা, গায়ে সাদা ব্লাউশ, পায়ে জুতা। কিশোরী পরম-স্নেহে ছেলেদের খেলায় যোগ দিয়া তাদের খেলার আনন্দ অনেকখানি বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

বেড়ার ওধারে দাঁড়াইয়া কাশিম খেলা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইল। সে যদি উহাদের সঙ্গে দলে মিশিতে পারিত! উহাদের ঐ হাসি-কলরবে নিজের কণ্ঠ মিশাইবার একটু সুযোগ পাইত!··· এমনি দেখা আর ভাবার মধ্যে তার কিশোর চিত্ত একেবারে তন্ময়!

ছেলেরা হঠাৎ তার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে দেখিয়া তার চমক ভাঙ্গিল। ছেলেরা কি বলিতেছে?

ছেলেরা তাকেই ডাকিতেছিল—ওরে···এই···

চারিধারে সে একবার চাহিয়া দেখিল, না, কাছাকাছি আর তো কেহ নাই! এরা তবে তাকেই···

ছেলেরা আগাইয়া আসিয়া কহিল,—আমাদের বলটা কুড়িয়ে দাও তো···

কাশিম তখন ব্যাপার বুঝিল, বুঝিয়া পাশে চাহিয়া ছাখে, ফুটবলটা তার কাছ হইতে খানিক দূরে পড়িয়া আছে। তাড়াতাড়ি সেটা কুড়াইয়া সে ছেলেদের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। ছেলেরা বল পাইয়া মহানন্দে তাহাতে কিক্ মারিতে ছুটিল। আর, কাশিম? ঐ বলটা যে সে স্পর্শ করিতে পাইয়াছে, ইহা ভাবিয়াই কৃতার্থ!

স্কুলের ঘণ্টা বাজিল। কিশোরী তখন সকলকে আহ্বান করিল। ছেলের দল তার সে-আহ্বানে এক-মুহূর্ত্তে খেলা বন্ধ করিয়া স্কুল-গৃহের দিকে ছুটিল।

কিশোরী ডাকিল—মহাবীর···

সাদা চাপকান-পরা এক বালকভৃত্য ছুটিয়া আসিল। বলটি তাহাকে কুড়াইতে বলিয়া কিশোরী স্কুল-গৃহে চলিয়া গেল।

স্কুল-গৃহের দিকে চাহিয়া কাশিম তেমনি দাঁড়াইয়া আছে। মাথার উপর রৌদ্র কখন মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে, সেদিকে তার হুঁশ ছিল না। ঐ···পড়ার বই ধরিয়া সুর করিয়া ওরা ও-কোন্ কল্পলোকের কি-বার্ত্তা সংগ্রহ করিতেছে ···কাশিমকে কে তাহা বলিয়া দিবে? ও-লোকেও এই আকাশ, এই বাতাস, এই গাছ-পালার দীঘল শ্যামল ছায়া,

পুকুরের এই কালো জল,—এই সবই আছে? না, কেবল পরীর স্বপ্নে, দৈত্যের ভয়ে ও-কল্পলোক পরিপূর্ণ? কাশিমের সারা চিত্ত ঐ কল্পলোকের একটু পরিচয় পাইবার জন্য অসহ্য আকুলতায় গুমরিয়া উঠিতে লাগিল।

হঠাৎ ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া বর্ষার বারিধারা বিপুল বেগে ঝরিয়া পড়িতে কাশিম চমকিয়া স্কুল-গৃহের ফটক পার হইয়া একেবারে টানা-বারান্দায় গিয়া উঠিল। ভিতরে ছেলের দল তাকে দেখিয়া চোখ ফিরাইল। কি মজাই না ওই ছেলেটির—এমন বর্ষায় বারিধারায় মাতন তুলিবার কি অবাধ অধিকার! কারো নিষেধ নাই! কোনো বাধা নাই! আর তারা···? কাশিম ভাবিতেছিল, এই নিবিড় মেঘের অন্ধকারে ঢাকা দুনিয়ার মাঝে যেটুকু আলো, তা ঐ ঘরের মধ্যে ছেলেদের হাতের বইগুলার পাতাতেই বুঝি গিয়া সব জড়ো হইয়াছে।

বৃষ্টির বিরাম নাই! নিবিড় কালো মেঘ আরো নিবিড়, আরো কালো হইয়া আসিল। বর্ষার ধারা আরো বেগে নামিল। সে আঁধারে ঘরের মধ্যে বইয়ের পাতায় ছাপা হরফ-গুলা অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সামনের ক্লাশে সেই কিশোরী পড়াইতেছে। কাশিমকে লক্ষ্য করিয়া ক্লাশের একটি ছেলে বলিয়া উঠিল,—একটা ছেলে বারান্দায় ভিজচে···

কাশিমকে কিশোরী লক্ষ্য করিয়াছে।

কিশোরী বাহিরে আসিল, কাশিমকে দেখিয়া কহিল,—কোথা থেকে তুমি আসচো?

কাশিমের বিস্ময়ের মাত্রা এমন বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, সে কোনো জবাব দিতে পারিল না। কিশোরী তার পিঠে হাত রাখিয়া সস্নেহ-কণ্ঠে কহিল,—তুমি তো আমাদের স্কুলে পড়ো না!

কাশিম এ-কথায় থতমত খাইয়া গেল। হঠাৎ স্কুল-বাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছে—হয়তো মস্ত অপরাধ করিয়াছে। কুণ্ঠিত স্বরে সে বলিল,—না।

কিশোরী কহিল,—কোথায় তুমি থাকো?

কাশিম কহিল,—দূরে···গাঁয়ে···বামুনপাড়ায়।

কিশোরী কহিল,—তোমার নাম?

কাশিম নিজের নাম বলিল। শুনিয়া কিশোরী বলিল,—কিন্তু তুমি তো মুসলমান। বামুনপাড়ায় থাকো যে?

কাশিম যেমন বুঝিত, তেমনি ভাবেই জবাব দিল,—আমার বাবা মরে গেছে। কেউ নেই। তাই মনিব আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে রেখেচেন।

কিশোরী কহিল,—তুমি লেখাপড়া করো না?

—না।

কিশোরী কহিল,—এই বৃষ্টিতে এখানে ভিজছিলে যে?

কাশিম বলিল, কাছের পুকুরে তার মনিব মাছ ধরিতে আসিয়াছেন, সেও আসিয়াছে সঙ্গে। তার ভালো লাগে নাই, তাই ঘুরিতে-ঘুরিতে এখানে আসিয়া ছেলেদের খেলা দেখিতেছিল, তারপর এই বৃষ্টি···

কিশোরী কহিল,—বড্ড ভিজে গেছ যে! ভিজে কাপড়ে

থাকলে অসুখ হবে। এসো, ও-কাপড় ছেড়ে ফ্যালো!

কাশিম কহিল, ছেলেবেলা হইতেই তার এ-রকম ভেজা অভ্যাস আছে।

কিশোরী কহিল,—না, না, তা হয় না। ভিজে কাপড় ছেড়ে ফ্যালো ···কিছু খাবে?

কাশিম কহিল,—খাবো।

তার বেশ ক্ষুধা পাইয়াছে। কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির সামনে ক্ষুধার কথা বলিতে চিরদিন সে কুণ্ঠিত থাকে। কিশোরীর কাছে এখনো আহারের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিত না! কিন্তু বহুক্ষণ ধরিয়া এই আবহাওয়া—কিশোরীর এই দরদ-মমতা তার প্রাণে এমন আকর্ষণের সৃষ্টি করিয়াছে যে, ইহাদের সঙ্গে মিশিতে, আলাপ করিতে, কথা কহিতে তার ঔৎসুক্যের আর সীমা-পরিসীমা ছিল না।

অদূরে এক ভৃত্য বসিয়াছিল। কিশোরী তাকে ডাকিল, —বয়···

বয় আসিল। কিশোরী কহিল,—বিস্কিট, ওর লজেঞ্জেস্ লা'ও।

ভৃত্য আদেশ-পালনে ছুটিল।

কিশোরী কাশিমকে প্রশ্ন করিল,—তোমার মনিবের নাম কি?

কাশিম বলিল,—নিতাইবাবু।

—হিন্দু? না, ব্রাহ্ম?

ব্রাহ্ম-কথার অর্থ কাশিম বুঝিল, ব্রাহ্মণ। সে জবাব দিল,—হ্যাঁ, বামুন।

কিশোরী অবাক হইয়া গেল। হিন্দু ব্রাহ্মণ হইয়া ফুলছড়ির মতো পল্লীগ্রামে মুসলমান ছেলেকে আশ্রয় দেওয়া—এ যে আশ্চর্য্য ব্যাপার! সে কহিল—তোমার মনিব কি করেন?

কাশিম জবাব দিল,—তেনার পাঁচখানা গাদাবোট আছে। পাটের কলে খাটে।

—বাড়ীতে তাঁর কে-কে আছেন?

কাশিম কহিল,—আর কেউ নেই। বাড়ীতে শুধু তিনি আছেন, আর এই আমি থাকি। আর একজন চাকর আছে, গোবরা।

কিশোরীর শ্রদ্ধা হইল এই নিতাই বাবুটির উপর। আবাল্য পাদ্রীদের হাতে সে মানুষ হইয়াছে। ছেলেবেলার কথা যতদূর মনে পড়ে, সেই জোন্‌স্‌ বাবা,—মস্ত দাড়ি, প্রশস্ত ললাট, দীপ্ত চক্ষু, আর স্নেহভরা বুক! বড় হইলে বাইবেলে যীশুর কথা পড়িবার সময় তাঁর মূর্ত্তিই যীশুখ্রীষ্ট-রূপে বালিকার চোখের সামনে উদয় হইয়াছে এবং আজও যীশুর কথা মনে হইলে সেই একান্ত দরদ আর স্নেহভরা মুখচ্ছবি চোখের সামনে জাগিয়া ওঠে! অতি-দরিদ্র অসহায় আতুরকে বুক পাতিয়া গ্রহণ করা—এ শুধু তাঁহারি পক্ষে সম্ভব ছিল। তারপর খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মিশিয়া এই কথাই সে শিখিয়াছে, হিন্দুরা বিধর্ম্মীকে···শুধু বিধর্ম্মীকে কেন, ছোটলোকদের মধ্যে বহু জাতিকে হীন পশুর মতো

অস্পৃশ্য-জ্ঞানে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে···তাদের ছায়া মাড়াইলে ঘৃণায় রী-রী করিয়া গঙ্গার জলে স্নান করিয়া তবে অশুচিতা মোচন করে।

মানুষের উপর মানুষের এই ঘৃণা তার বুকে বাজিয়াছে চিরদিন, এবং তাই এ-ঘৃণা যতখানি পারে, কাটাইয়া ইতর-ভদ্রনিবিশেষে সকলের প্রতি দরদী হইবার প্রয়াস পাইয়া আসিতেছে। এইজন্যই সে লেখাপড়া শিখিয়া সংসার-জীবনের সংকল্প ত্যাগ করিয়া ছেলে পড়াইবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। বেত লইয়া পড়া গিলাইবে, এ-উদ্দেশ্য তার মোটেই নাই। স্নেহ-মায়ায় ছাত্রদের মন যাহাতে ভরিয়া তুলিতে পারে, ইহাই তার লক্ষ্য।

সম্প্রতি তাদের মিশন হইতে ফুলছড়ির এ-পাড়ার জমি লইয়া সে জমির উপর স্কুল খোলা হইয়াছে। কিন্তু গ্রামের সাবধানী ভদ্র-সম্প্রদায় সে-স্কুলে ছেলে পাঠাইতে নারাজ। ছেলেরা বাপ-পিতামহের ধর্ম্ম ছাড়িয়া শেষে খ্রীষ্টান্ বনিবে? কাছাকাছি আর কোনো স্কুল নাই, বহু দূরে, সে বজবজে না কোথায় একটি আছে। ছেলেরা রৌদ্র-ঝড়ে মাঠ ভাঙ্গিয়া, ট্রেন ধরিয়া সেখানে যায় লেখাপড়া শিখিতে। ফুলছড়ির স্কুল কাজেই খালি পড়িয়া আছে।

মিশনের কর্তৃপক্ষ তখন অন্য জায়গা হইতে অনাথ ছেলেদের জড়ো করিয়া এখানে পাঠাইয়া দিল। তারা বোর্ডিংএ থাকে এবং এই স্কুলে লেখাপড়া করে। এখানকার স্কুলের কর্ত্রী হইয়া আসিল

এই কিশোরী। কিশোরীর নাম—সুমিত্রা। পাদ্রী জোন্স তার একটা বিলাতী নামও দিয়াছে—সিসিল্। সুমিত্রা নাম তার মায়ের দেওয়া। ছেলেবেলায় সিসিল্-সুমিত্রা নামটাই চলিত ছিল। বড় হইয়া সে যখন সব বুঝিতে শিখিল, তখন বিলাতী সিসিল্টুকু বাদ দিয়া সুমিত্রা-নামই বজায় রাখিয়াছে।

মিশনের সঙ্গে অনেক তর্ক করিয়া সুমিত্রা বুঝাইয়া দিয়াছে, ছেলেদের লেখাপড়া এবং দেখাশুনার ভার পুরুষের হাতে দিলে ঠিক হইবে না। ছোটদের দেখাশুনার ভার দেওয়া উচিত মেয়েদের হাতে। দরদে-স্নেহে চরিত্রকে গড়া যেমন সহজ হয়, ছেলেদের আব্দারও তেমনি মেয়েরাই শুধু সহিতে পারে। তাদের সুখ-দুঃখের খুঁটি-নাটি খবরও মেয়েরা রাখিতে জানে, এবং কাজেই সে-খবর রাখিয়া চারিদিক বুঝিয়া তাদের মনগুলিকে বাঁকাইয়া নোয়াইয়া অনায়াসে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে। এ-কথার মূল্য বুঝিয়া মিশন এ-স্কুলের ভার তার হাতেই অর্পণ করিয়াছে।

তার সঙ্গে আর একটি মহিলা শিক্ষয়িত্রী আসিয়াছে, মেরি জ্যোৎস্না এবং একজন শিক্ষক—নীলকণ্ঠ স্মিথ। স্কুলের সংলগ্ন যে তিনকামরা-ওয়ালা বাংলো আছে, তারি দুটি কামরা সুমিত্রার; অপরটি জ্যোৎস্নার। স্কুলের বাহিরে ছোট একখানি বাংলো—সেই বাংলোয় নীলকণ্ঠ স্মিথ বাস করে।

সুমিত্রা এখানে আসিয়া ভদ্র-পল্লীতে লোক পাঠাইয়া বহু সাধ্য-সাধনাতেও যখন স্কুলে ছেলে পাঠানোয় তাদের রাজী

করাইতে পারিল না, তখন তার মনে বেদনা জাগিল। সে-বেদনায় ধৈর্য্য না হারাইয়া ইতর-পল্লীর ঘরে-ঘরে গিয়া পল্লী-বাসীদের প্রথমে মিষ্ট ব্যবহারে ও মিষ্ট বচনে সে বিমুগ্ধ করিল; পরে ভালো করিয়া বুঝাইয়া বিনা-বেতনে তাদের ছেলে-মেয়েদের আনিয়া স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া লইল। বেচারা অনাদৃত ইতর-সম্প্রদায় —দেশের লোকজনের কাছ হইতে দরদের এতটুকু ক্ষীণ রেখাও কোনো দিন লাভ করে নাই—তারা সুমিত্রার কথায় ও ব্যবহারে গলিয়া গেল এবং বিনা-খরচে ছেলেদের লেখা-পড়া শিখাইলে, ভবিষ্যতে তাদের চাকরি মিলিবে···চাকরির এমন সুযোগ যখন আয়ত্তে, তখন সে-সুযোগটুকু হেলায় হারাইয়া তাদের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে তারা একনিমেষ ইতস্তত: করিল না।

বয় লজেঞ্জেস ও বিস্কুট আনিয়া দিলে, সুমিত্রা কাশিমের হাতে সেগুলো দিল, দিয়া কহিল,—খাও।

কাশিম বিস্কুট মুখে দিল। সুমিত্রা বলিল,—তুমি স্কুলে পড়বে? তোমার মনিবকে বলো, এখানে পড়লে পয়সা লাগবে না। বুঝলে?

কাশিম ঘাড় নাড়িয়া জানাইল; এ-কথা মনিবকে বলিবে।

সুমিত্রা কহিল,—তোমার মনিবের বাড়ী তোমাকে কোনো কাজ-কর্ম্ম করতে হয়?

কাশিম কহিল,—না।

সুমিত্রা ভাবিল, মনিব বেশ ভালো লোক তো! পরের

ছেলেকে ঘরে রাখিয়া খাইতে দেয়, অথচ তাকে পিষিয়া কাজ আদায় করে না! এমন স্বার্থজ্ঞান-হীন লোক অনেক এ-গ্রামে আছে!

খাওয়া চুকিলে কাশিমের মনে হইল, অনেকক্ষণ সে পুকুর ছাড়িয়া এখানে আসিয়া রহিয়াছে। সেখানে যদি কোনো প্রয়োজন থাকে? ব্যস্ত হইয়া সে কহিল,—আমি এখন যাই।

সুমিত্রা কহিল,—ভিজে কাপড় ছেড়ে তবে যাবে।

কাশিম কহিল,—তাতে কি! আমাকে হামেশা জলে ভিজতে হয়···ভেজার অভ্যাস আছে।

সুমিত্রা কহিল,—না, তা হবে না। এই জলে ভিজলে সক্ত অসুখ করবে। বিশেষ, ভিজে-কাপড়ে কতক্ষণ তোমাকে থাকতে হবে তার ঠিক কি! তার পর ঐ কাপড়েই তো বাড়ী ফিরবে! একটা ছাতাও আনিয়ে দি। ছাতা নিয়ে যাও।

কাশিম আকাশের দিকে চাহিল, চাহিয়া কহিল,—বৃষ্টি ধরে' গেলে দিয়ে যাবো'খন। আচ্ছা, ছাতা দিন। ওখানে ওঁরাও তো ভিজচেন।

সুমিত্রা কহিল,—তোমার মনিব মাছ ধরতে এসেচেন—বললে না? তা, এ-বৃষ্টিতে মাছ পাবেন?

কাশিম বলিল,—হুঁ—মাছ জলে-বৃষ্টিতেই আমি কত দেখেছি।

তুমি এক কাজ করো। ছাতা নিয়ে যাও। তাঁরা যদি পথে দাঁড়িয়ে ভেজেন, তাহলে এখানে আসতে বলো। তার পর বৃষ্টি ধরলে সকলে বাড়ী যাবেন।

ছাতা আসিল। কাশিম ছাতা মাথায় দিয়া বাহির হইয়া গেল। পুকুর-ধারে গিয়া দেখে, মস্ত একটা কচু-পাতায় মাথা ঢাকিয়া নিতাই ছিপ লইয়া তেমনি বসিয়া আছে, আর শশী এক গাছ-তলায় বসিয়া—শশীর পায়ের সামনে ক'টা মাছ।

মাছ দেখিয়া কাশিম আনন্দে লাফাইয়া উঠিল, উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিল—কখন ধর্‌লেন? যেই আমি গেছি···না?

শশী কহিল,—আমি একটা ধরেচি, বাকীগুলো ধরেচে নিতাই।

কাশিম কহিল,—আপনি আর ভিজবেন না। ছাতা এনেচি। নেবেন?

কাশিম ছাতা আগাইয়া ধরিল।

মুসলমানের হাতের স্পর্শ! সংস্কার আবার মাথা তুলিল। শশীর ছাতার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবু ঐ সংস্কারকে চাপিয়া হত্যা করিবার জন্যই সে হাত বাড়াইয়া ছাতা লইল; তার পর কাশিমের পানে চাহিয়া কহিল,—আমি গাছতলায় আছি, তত জল পাচ্ছি না। ছাতাটা বরং নিতাইকে দাও। কচুপাতা ছেড়ে ছাতার তলায় মাথাটা ওর রক্ষা পাবে!

কাশিম ছাতা লইয়া নিতাইয়ের কাছে গেল। এত বৃষ্টি—নিতাইয়ের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই! সেই প্রচণ্ড বর্ষা মাথায় করিয়া ফাৎনাতে সমস্ত মন সঁপিয়া বসিয়া আছে! কাশিম অগত্যা ছাতা খুলিয়া নিতাইয়ের পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল। আর আকাশ ছাপাইয়া বর্ষার অবিরাম ধারা ঝম্‌ঝম্‌ শব্দে মাতিয়া মহাসাগর-সৃষ্টির উল্লাস-কল্পনায় অঝোরে ঝরিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুমিত্রা

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বৃষ্টি থামিল। পথ একেবারে নদী-নালায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

মাছ ধরার পর্ব্ব শেষ করিয়া নিতাই কাশিমকে প্রশ্ন করিল, —এ ছাতা তুই কোথায় পেলি?

কাশিম ছাতার বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। তাকে যে দরদ করিয়া স্কুলের মেম-মা খাবার খাইতে দিয়াছে, সে কথাও গোপন রাখিল না। শুনিয়া নিতাইয়ের মন স্কুলের মেম-মার প্রতি প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল। তবে যে সে শুনিয়াছিল, বিবি-মা লজেঞ্জেসের জাল পাতিয়া এ দেশের ছেলেগুলার জাত মারিয়া তাদের খৃষ্টধর্ম্মে আসক্ত করিয়া তুলিবার সঙ্কল্পে স্কুল খুলিয়াছে এবং সেজন্য পল্লীর যত ইতরের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া মোহিনী মায়ায় মা-বাপদের মুগ্ধ করিয়া ছেলেগুলাকে বিনা-বেতনে স্কুলে ঢুকাইয়াছে—এ সব কথা অলীক রটনামাত্র! নহিলে বাহিরের ছেলে কাশিমকে ডাকিয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে খাইতে দিবে কেন? আর এই জলে ভিজিয়া পাছে তার

অসুখ করে, ইহা ভাবিয়া এতখানি বিশ্বাস করিয়া তার হাতে ছাতাই বা ছাড়িয়া দিবে কেন?

নিতাই বলিল,—গোটা সাতেক মাছ আছে। তা…তোমার কটা চাই, শশীদা?

শশী কহিল,—একটা হলেই হবে। আমার বাড়ীতে খাবার লোক বলতে তো আমি একমেবাদ্বিতীয়ং!

নিতাই কহিল,—পাড়ার কাউকে দেবে না?

শশী কহিল—ঐ হতভাগাগুলোকে? রাম বলো!

নিতাই কহিল,—বেশ, আমিও একটা নেবো আর একটা দেবো গফুরকে,…তারই পুকুর কি না। বাকী থাকে তাহলে চারটে! এ চারটে কাশিমের ঐ মেম-মাকে দিয়ে যাই।… এতগুলি ছেলে স্কুলে পড়ে—তারা খেয়ে খুশী হবে। কি বলো শশীদা?

শশী কহিল—এত ভিজে এত মেহনৎ করে ধরা মাছ…তা খাবে ঐ খ্রীষ্টানগুলো?

নিতাই কহিল,—কাকে দিতে চাও, বলো? তোমার কোন্ পরম-হিন্দু বন্ধু আছে, বলো, যাকে দিলে তুমি খুশী হবে?

শশী কহিল,—তা বটে! যত ব্যাটা স্বার্থপর বদমায়েস! খাবার নোলা সব এতখানি! তাদের দেওয়ার চেয়ে…

শশীর মুখের কথা লুফিয়া নিতাই কহিল,—এই নির্বিরোধী খৃষ্টানদের মুখে দিলে তৃপ্তি…কেমন? আমিও তাই বলছিলুম। ভাবো তো শশীদা, ঘরে বসে পরচর্চ্চা করলে কি আরামেই এদের

দিন কাটতো ! তা না করে গাঁটের পয়সা ব্যয় করে যাদের মুখের পানে চাইতে কেউ নেই, সেই সব বেচারীদের খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে, বিদ্যা দান করচে ! তাও এ দান খৃষ্টানকে নয়···বিধর্ম্মীকে ! এত বড় বেকুব !···এ মাছ ঐ বেকুবদেরই খাওয়ানো যাক্। এরা খেয়ে আর কিছু না করুক, অন্ততঃ এ কথা বলবে না যে, হতভাগাগুলো খেটে মাছ ধরলে, আর তাদের ঠকিয়ে সে-মাছে আমরা রসনার কি পরিতৃপ্তিই না সাধন করছি !

এ শ্লেষের অর্থ পূরাপূরি উপলব্ধি করিয়া শশী হাসিয়া উঠিল, কহিল,—ঠিক কথা বলেচো নিতাই ! তাই চলো। এতে কাশিমের তরফ থেকে ধন্যবাদও ভালো রকমে জানানো হবে।

নিতাই কহিল,—অন্ততঃ হিন্দু ছাতার ঋণ স্বীকার করে, এ কথাটা খৃষ্টানদের বোঝানো যাবে তো !

শশী এ-কথার অর্থ ঠিক বুঝিল না, শুধু বলিল—চলো তাহলে।

গাছে অনেকগুলো লতা ঝুলিতেছিল। একটা লতা ছিঁড়িয়া সেই লতায় বাঁধিয়া কাশিম মাছগুলি হাতে লইল।

নিতাই কহিল,—তুই একা পারবিনে, কাশি,—কতকগুলো আমাকে দে। ছাতাটা বরং তুই নে। আর ছিপ্ দুটো তুমি নাও শশীদা।

তারপর তিনজনে অগ্রসর হইল। স্কুলের ছুটী হইয়া গিয়াছে। কাছাকাছি যে-সব বাড়ী হইতে ছেলেরা স্কুলে রোজ পড়িতে আসে, তারা সকলে চলিয়া গিয়াছে। স্কুলের খেলার মাঠে ছেলেরা সেই বল লইয়া মাতামাতি করিতেছে ; এবং দালানের

বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়া একটা ভৃত্য জামা গায়ে দাঁড়াইয়া আছে।

তিনজনে আসিয়া স্কুলের সুমুখে দাঁড়াইল এবং নিতাই সেই ভৃত্যকে হাতছানি দিয়া ডাকিল,—এই ছোকরা···

ভৃত্য কাছে আসিল। নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া শশী কহিল,—এর হাতে সমর্পণ করা ঠিক হবে না। কোথা থেকে মাছ এলো, কেন এলো, কেউ বুঝবে না। তাছাড়া ছাতাটা যদি উড়িয়ে ছ্যায়—কি বলো?

নিতাই হাসিল, হাসিয়া কহিল,—দেশের লোক, স্বধর্ম্মী হয়তো, কিন্তু তাকে আমরা কতখানি অবিশ্বাস করি, বলো তো শশীদা!

শশী একটু অপ্রস্তিভ হইল, কহিল,—কি জানি ভাই, আমার মন হয়তো খুব ছোট···

নিতাই কহিল,—তোমার মন ছোট নয়। আমরা এমনিতেই ছোট হয়ে গেছি। তাছাড়া অবিশ্বাস এমনি জাগে না, শশীদা। বহু-পরীক্ষায় মন এই অবিশ্বাসকেই মেনে নেছে! এ অবিশ্বাস আমাদের অভিজ্ঞতায় এখন মাথা তুলে শক্ত হয়ে গজিয়েছে। এ কতখানি দুর্ভাগ্য, বলো তো!

এইটুকু বলিয়া কাশিমের পানে চাহিয়া নিতাই প্রশ্ন করিল,—মেম-মা বল্‌লি না?

কাশিম ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

নিতাই তখন ভৃত্যকে কহিল,—মেম-মা কোথায় রে?

ভৃত্য পদ-মর্য্যাদা বুঝাইতে ঠোঁট একটু বাঁকাইল; তারপর অবিচল কণ্ঠে উত্তর দিল,—বাসায়।

নিতাই কহিল,—বাসা কোথায়?

বাংলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ভৃত্য কহিল,—হুইযে।

নিতাই কহিল,—একবার সেলাম জানিয়ে বল্ যে, তিনটি লোক এসেচে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। দরকার আছে।

ভৃত্য কহিল—এখন তিনি চান করচেন। তার পর চা-টা খাবেন। এখন দেখা হবে না।

নিতাই বিরক্ত হইলা, কহিল,—আরে মর্, রাশভারি করচে খুব। তারপর বেশ চড়া গলায় কহিল—চা খাচ্ছেন, কি কি করছেন, তোর অত বক্তৃতার দরকার কি? বলচি, দরকার আছে···তুই খপর দে! ছুঁচো কোথাকার!

নিতাইয়ের ঝাঁজালো কথায় ভৃত্য একটু বিচলিত হইল। সাহেব-মনিবের কাছে সে কাজ করিতেছে, এমন ঝাঁজ দেশী লোকের কাছ হইতে কখনো প্রত্যাশা করিতে পারে না! কিন্তু নিতাইয়ের বলিষ্ঠ দেহ আর সুদৃঢ় কণ্ঠস্বরে তর্ক বাড়াইবার সাহস হইল না তার। সে কহিল—কাট্ আছে?

কাট! নিতাই একটু অবাক হইয়া ভাবিল। পরক্ষণে হো-হো করিয়া হাসিয়া কহিল,—ও, কার্ড! ব্যাটার সব দিকে কেতা দুরস্ত দেখচি!···কাট নেই, তবে মাছ আছে। আর এই ছাতা—তোর মেম-মার ছাতা। যা, গিয়ে বলবি, ছাতা ফিরিয়ে দিতে এসেচি।

ভৃত্য কহিল,—তা আমাকে দাও না!

নিতাই কহিল—তোর হাতে দেবো না। তারপর ভৎসনার স্বরে কহিল—তুই খপর দিবি কি না, বল্? নাহলে আমার যা করবার, করি!

ভৃত্য এবার বিরক্তির স্বরে কহিল—আচ্ছা, দাঁড়াও, আমি খপর দি। বলিয়া সে চলিয়া গেল বাংলোর দিকে!

নিতাই কহিল,—দেখলে শশীদা, এই পুঁচকে চাকর ছোঁড়াটার আস্পর্দ্ধা! তোর মনিবের সঙ্গে দেখা করতে এসেচে ভদ্দর লোক, আর তুই গ্রাহ্য করবি না! আমাদের দাঁড় করিয়ে হাজার কথা তুলবে! সমাজের দোষ সব ব্যাপারে যে দাও—এখানে তো তোমার সমাজ নেই।

শশী কোনো জবাব দিল না···চাহিয়া রহিল নিতাইয়ের পানে···নির্বাক ভঙ্গী।

নিতাই বলিল,—তবু এ ব্যাটার এ রকম প্রবৃত্তি কেন, বলো তো? ··স্রেফ কুশিক্ষা আর কুসংস্কার। তাতে এর মন এমন আচ্ছন্ন যে একটুখানি সাহেব-মনিবের ঘেঁষ পেয়ে নিজেকে প্রবল প্রতাপান্বিত ঠাউরে নিয়েচে! কলকাতায় অনেক সাহেব-সুবোর সঙ্গে আমায় দেখাশুনা করতে হয় তো, সেখানেও দেখেচি, সাহেবরা আমাদের অগ্রাহ্য করে না! অগ্রাহ্য করে তাদের চাকর-নফর-কেরাণী-চাপরাশির দল। তারা আমাদেরি দেশের লোক কি না! দেশের লোককে দেশের লোক যেমন হীন চক্ষে দেখে, বিদেশী-লোক তেমন দেখে না! ডোম-চাঁড়ালকে বামুন-কায়েতরা

যে-চোখে দেখে, এই সব ডোম-চাঁড়াল চাকর-বাকর সাহেবের তাঁবে দু-দশ টাকার চাকরি পেয়ে বামুন-কায়েতকেও ঠিক সেই রকম তাচ্ছিল্যের চক্ষে দেখে! এ রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা করে দেখো,—এ সবের মূলে .সেই এক কারণ—ক্ষমতার দম্ভ! তা সে-ক্ষমতা শাস্ত্র থেকেই আসুক আর বাতাসে বয়েই আসুক্।

শশী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিল, কোনো জবাব দিল না। কথা শেষ করিয়া নিতাই ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিল; তারপর মাঠে ছেলেরা ফুটবল লইয়া খেলা করিতেছিল, তাদের একজনকে ডাকিল।

সে কাছে আসিলে নিতাই প্রশ্ন করিল—তোমরা এই স্কুলেই থাকো?

সে বলিল,—হাঁ।

—তোমাদের মা-বাপ যে ছেড়ে দেছে?

—মা-বাপ নেই।

—কে আছে?

সে-ছেলেটি কহিল, তার এক মামা আছেন—তিনিই কোনো সূত্রে খপর পাইয়া এখানে তাকে রাখিয়া গিয়াছেন। আর একটি ছেলে আসিয়াছিল; তাকে প্রশ্ন করিতে সে কহিল, তার বড় ভাই শ্বশুর-বাড়ীতে থাকে; সেখানে তার থাকা দুঃসহ ঠেকিতে এখানে পাঠাইয়াছে।

নিতাই কহিল,—হুঁ! তোমাদের খরচ-পত্র তাঁরা দেন?

দুজনেই কহিল, না, খরচ লাগে না। এখানে বিনা-খরচায় থাকিবে আর লেখাপড়া শিখিবে বলিয়া তাদের পাঠাইয়াছে।

নিতাই কহিল—ছাখো শশীদা দেশের লোককে, নিজের ভাই, মামা যাদের পুষতে চায় না, কোন্ মুল্লুক থেকে বিধর্ম্মী এসে তাদের বুকে তুলে নিয়ে লালন-পালন করচে! সত্যি, এদের কথা শুনে এদের উপর আমার এমন শ্রদ্ধা হচ্ছে যে আমি ভাবচি, সারাদেশের লোক যদি হুড়মুড় করে আজ জর্ডানের জল মাথায় দিয়ে খৃষ্টান হয় তো আমি হরির লুট দি! দূর, দূর, যত ব্যাটা সমাজপতি···খালি নিজের পকেট, নিজের স্বার্থ, আর পরকে একঘরে করার মতলব নিয়ে পড়ে আছে! এ-জাতে আবার মানুষ! এ জাতের আবার সমাজ!

অসংবদ্ধ অনেক কথাই নিতাই বলিতে লাগিল। এমন কথা নিতাইয়ের মুখে শশী নিত্য শোনে, এবং শুনিয়া শুনিয়া সমাজকে হীনতার পঙ্কে মজ্জিত দেখিয়া দেশের মানুষের বিরুদ্ধে শশীর মনও থাকিয়া থাকিয়া ফুঁশিয়া ওঠে! কিন্তু এমন করিয়া এত খুঁটিনাটী তার চোখে পড়ে না এবং সে খুঁটিনাটীর সম্যক আলোচনাও তার দ্বারা সকল সময়ে সম্ভব হয় না।

নিতাইয়ের কথায় তার চোখের সামনে সমাজের শত-ক্ষত-জীর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন বীভৎসতায় ভরিয়া উদয় হইল যে, শশী শিহরিয়া উঠিল! তার মনে হইল, যদি তেমন শক্তি থাকিত তো প্রবল চপেটাঘাতে সমাজের দৃষ্টিকে এদিকে ফিরাইয়া ধরিয়া সে বলিত, এগুলা সরাইয়া তোল্, নহিলে দু'দিন পরে তোর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু কাকেই বা সে এ-কথা বলিবে? তাই চুপ করিয়া নিতাইয়ের পানে চাহিয়া রহিল।

ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, মেম-মা এখনি আসিবেন এবং বাবুরা ইচ্ছা করিলে ঘরে আসিয়া বসিতে পারেন।

নিতাই কহিল,—থাক্, ভিজে কাপড়ে আর ঘরে ঢোকে না। তোর মেম-মা যতক্ষণ না আসেন, এইখানেই দাঁড়াই।

তারপর শশীর দিকে চাহিয়া নিতাই কহিল;—এখানে এই স্কুলটুকু খুলতে এদের কম বেগ পেতে হয়নি, শশীদা! তুমি তো সব জানো! এই গ্রামে এত ভদ্রলোকের বাস, অথচ একটা স্কুল নেই। বাবা নিজে থেকে কিছু টাকা দিতে স্বীকার হয়ে ঐ সতু বাঁড়ুয্যের দলকে সেধেছিলেন, সকলে মিলে কিছু কিছু টাকা দিয়ে ছোটখাট একটা স্কুল নিদেন খোলো। বাবা বলেছিলেন, কোঠা-বাড়ী নয়—আটচালাতেই ছেলেরা পড়বে। একটা স্কুলের আবহাওয়ায় লোকের লেখা-পড়ায় প্রবৃত্তি জাগে কতখানি! তা সতু বাঁড়ুয্যের দল সে-কথা কাণে তুললো না। তারপর এরা যখন আমাদের পাড়াতে জমি নিতে আসে, তখন গ্রামের লোক এককাট্টা হয়ে বললে, খৃষ্টান এসে বুকের উপর বসবে! উঁহুহু! আরে বাপু, ওরা তো তোদের তলোয়ার দেখিয়ে বলচে না যে, সকলে খৃষ্টান হ'। যদিও এটা ঠিক, তলোয়ার দূরের কথা, একগাছা চাবুক দেখিয়ে এরা যদি বলে, যে খৃষ্টান হবে না, তার পিঠে এই চাবুক পড়বে, তাহলে ঐ চরণ ভট্‌চায্যি, সতু বাঁড়ুয্যে···দেখবে, ওরাই সবার আগে ছুটবে পাঁজিপুথি ফেলে বাইবেল নিতে!···এরা এলো তোদের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে। তাও বিনা-পয়সায়

লেখাপড়া শেখাবে। তাছাড়া খেলাধূলা। না, হিন্দুধর্ম্মের যত ব্যাটা বকাসুর তিলার্দ্ধ-জমি দিয়ে এদের সাহায্য করলে না!··· তখন এরা এলো এই মুসলমান-পাড়ায়,—এসে জমি নিলে, স্কুল খুললে! তাও না হয় ছেলেদের স্কুলে পড়তে পাঠা, তাতেও বাদ! হুঁ, এতে ক্ষতি কার?

নিতাইয়ের কথা শেষ হইল না, তার পূর্ব্বেই সুমিত্রা আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া ভৃত্যকে কহিল,—বাবুদের ভিতরে নিয়ে আয়।

তার আবির্ভাবে নিতাই এবং শশীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

কাশিম কহিল,—ঐ যে মেম-মা···

ইনিই মেম-মা!

যেন সাক্ষাৎ দেবী-বীণাপাণি তাঁর কমল-আসন ছাড়িয়া ইট-কাঠে গড়া বাড়ীর বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন! চোখে জ্যোতি আর আশা একেবারে জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে! ভার্জ্জিন মেরির ছবি নিতাই দু'চারিখানা বইয়ের পৃষ্ঠায় দেখিয়াছে···মনে হইল, যেন ভার্জ্জিন মেরি স্বয়ং···

শ্রদ্ধায় তার মাথা আপনি আনত হইল! সে সুমিত্রার পানে চাহিল।

মৃদু হাস্যে সুমিত্রা কহিল—আপনারা ভিতরে আসুন।

নিতাই বারান্দার ঠিক সামনে আসিল। কহিল,—ভিজে কাপড়।

সুমিত্রা, কহিল,—তাতে কি! আপনারা আসুন। এই যে সে ছেলেটি। এসো! তারপর ভৃত্যকে কহিল,—তিনখানা চেয়ার নিয়ে আয় বারান্দায়।

ভৃত্য আদেশ পালন করিলে সুমিত্রা বলিল,—বসুন আপনারা।

নিতাই কহিল,—আপনি আগে বসুন।

সুমিত্রা আসন গ্রহণ করিলে নিতাই চেয়ার টানিয়া বসিল এবং শশীকে বসিতে বলিল। শশী বসিল।

কাশিমকে দেখাইয়া নিতাই কহিল,—এই ছেলেটির মুখে আপনার করুণার কথা শুনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা হলো। তাই কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য সামান্য ভেট এনেচি। এই মাছগুলি···যে-ছেলেদের স্নেহে আর মায়ায় আপনি এই বনবাস শিরোধার্য্য করেচেন, তাদের তৃপ্তির জন্য তুচ্ছ ভেট! তারা যদি এ-মাছ খায়, আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

এ-কথায় সুমিত্রার মুখ সস্মিত হইয়া উঠিল। সে বলিল,—আপনার কথায় বুঝচি, আপনি ঐ অনাথ মুসলমান ছেলেটিকে আশ্রয় দেছেন। আপনার নাম নিতাইবাবু?

নিতাই কহিল,—আমার নাম নিতাই। সামাজিক ভাবে নিতাইচরণ চট্টোপাধ্যায়। ব্রাহ্মণ-সন্তান। গলায় যজ্ঞোপবীত···

সুমিত্রা কহিল—আপনার মহত্ত্বের পরিচয় কিছু পেয়েচি একটু আগে আপনার ঐ কাশিমের কাছে।

নিতাই লজ্জায় মাথা নত করিল; পরক্ষণে কহিল—আমি মহত্ত্ব-টহত্ত্ব বুঝি না। একটা অনাথ ছেলে, কেউ কোথাও নেই, অথচ নিজের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানের শক্তি হয় নি! রোগে

দেখবে এমন জনের অভাব, তাই তাকে কাছে রেখে তার কষ্ট যতখানি হাল্‌কা করা যায়—এই মাত্র !

দু-চোখে সস্মিত দৃষ্টি···সুমিত্রা কহিল—ক'জন তা করে ?

নিতাই কহিল—সকলের প্রবৃত্তি সমান নয়, জানি। তাছাড়া তাদের সংসার আছে, স্ত্রী-পুত্র আছে। আমার এমন কেউ নেই যাকে দেখতে হয়। আমার বোটের কারবার। কতকগুলো মাছি-মাল্লা আছে—তাদের কাছ থেকে হিসেব নেওয়া—ব্যস্‌ ! আমাকে তারা ভালোও বাসে। জুয়াচুরি-তঞ্চকতা করে না ! অর্থাৎ লোকের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাওয়া মোটেই শক্ত নয়। শুধু একটু মিষ্টি কথা আর তাদের উপর একটু দরদ···ব্যস্‌ !

এ লোকটির দুটো কথাতেই সুমিত্রা বুঝিল, কতখানি মহৎ প্রাণ ঐ শক্ত পেশীর নীচে বুকের মধ্যে টলটল করিতেছে ! সে কহিল,—সে কথা ঠিক !

নিতাই তৎক্ষণাৎ কহিল,—এই আপনাদের দেখচি···যে শিক্ষা পেয়েচেন এবং যে-ভাবে বড় হয়েচেন, তাতে অন্ততঃ ঘরে বসে আরামে আয়েস করে' আপনি সময় কাটাতে পারতেন ! তা না করে এই সব ইতর লোক—ভদ্র-দল যাদের অস্পৃশ্য বলে ঘৃণায় দূরে ঠেলে রেখেচে—মানুষ বলে' মনে করে না, শেয়াল-কুকুরের সামিল ভাবে—এ-ভাবে তাদের সঙ্গ দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, তাদের নিয়ে এই যে সংসার গড়ে' বাস করচেন, এতে কতখানি মহত্ত্ব প্রকাশ পাচ্ছে, বলুন তো ! আপনারা খৃষ্টান—

পরোক্ষে আপনাদের পাদ্রী-সাহেবদের মনে যে গভীর অভিসন্ধিই থাকুক, প্রত্যক্ষভাবে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করে, মনুষ্যত্ব আর মর্য্যাদাবোধ শিখিয়ে তাদের কি উপকার যে করচেন! পাদ্রীরা কি বোঝে না যে, একশোজন হিন্দু-মুসলমানকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করবার চেষ্টা হয়তো একেবারে নিষ্ফল হবে! তবু এই দান আর স্নেহ-মমতা—এতে তো কখনো কৃপণতা করচে না! দেশে দেশে এই যে সব ইনষ্টিটিউশন তারা খুলচে, তার গূঢ় উদ্দেশ্য যাই হোক, কতখানি লোক-সেবা হচ্ছে তাতে! আমাদের জাতের ঐ সব ছোট লোক··· আমাদের আরাম দেবার জন্যই যাদের জন্ম হয়েচে···ভাবি, তাদের পোঁটাঝরা নোংরা ছেলেগুলোকে চোখে দেখলেই আমরা ঘৃণায় শিউরে সরে যাই···আর আপনারা তাদের নাকের পোঁটা মুছিয়ে কোলে তুলে নিচ্ছেন!...ধর্ম্ম? আমাদের সমাজেও অনেক ধর্ম্মধ্বজ আছেন, কপালে ফোঁটা, গলায় মালা—মুখে নামজপ—ভগবানকেই সর্ব্বস্ব জানেন। কিন্তু তাঁরা যেখানে হাঁকচেন—তফাৎ যাও, দুনিয়া অশুচি···আপনারা সেখানে বলচেন, কাছে এসো, কাছে এসো, ভাই, মিতা, বন্ধু তোমরা! ··তাই ভাবি, এতখানি মমতায় সারা দুনিয়া আজও কেন খৃষ্টান হয়ে যায় নি!

সুমিত্রা বহিল—আপনি ভাবচেন, আমি খৃষ্টান? তা নই। আমার খুব ছোট বয়সে মা-বাপ মারা যান, খৃষ্টান পাদ্রীর হাতে আমি মানুষ হই। তিনি আমায় আদর করে সিসিল

বলে ডাকতেন,—এই যা! কখনো তিনি খৃষ্টান হতে বলেন নি! মাথায় জল ছিটিয়ে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষা দিতেও চান্‌নি কোনোদিন! অথচ তা করবার সুযোগ ছিল কতখানি! করলে অপরাধও হতো না! এতখানি স্নেহ, এমন আশ্রয় যে পেয়েচে, কৃতজ্ঞতার জন্যও হয়তো সে খৃষ্টান হতে পারতো! বিশেষ, আমি খৃষ্টান হলে কোনো দিক থেকে যখন কোনো নিষেধ উঠতো না! এবং খৃষ্টান-হিন্দু মুসলমান···সকলে যখন আমার কাছে সমান! বাইবেল যেমন পড়েছি, তেমনি রামায়ণ-মহাভারতও চাইবামাত্র পড়তে পেয়েচি। আমাকে এঁরা একদিনের জন্য প্রশ্ন করেন নি, আমি খৃষ্টান হবো কি না?

নিতাই বেশ বিস্মিত হইল, কহিল,—আপনি তাহলে খৃষ্টান নন! আমার ধারণা ছিল, খৃষ্টান ছাড়া এখানকার কর্ত্তৃত্ব অখৃষ্টানের হাতে পড়তে পারে না! আশ্চর্য্য কথা তো!

সুমিত্রা কহিল,—যাক্, শুধু বাজে কথাই হচ্ছে, অথচ আপনারা ভিজে কাপড়ে অপেক্ষা করচেন!

নিতাই কহিল,—আজ আমরা আসি। আপনার বেয়ারাকে বলুন, মাছগুলো নিয়ে যেতে। আর এই ছাতাটা। এর আর দরকার হবে না। বৃষ্টি থেমে গেছে।

সুমিত্রা কহিল—একদিন দুপুরবেলা এসে স্কুল দেখে যাবেন···কি রকম কাজ হচ্ছে! হাজার হোক, মূর্খ স্ত্রীলোক তো আমি!

হাসিয়া নিতাই কহিল,—আমাকে বুঝি আপনি মস্ত পণ্ডিত ঠাউরেচেন! যদি বলেন তো আমার এই শশীদা আছে…ওর দাদা কলকাতার কলেজে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর মন ভারী উঁচু ছিল…মারা গেছেন। আর শশীদা আমার সঙ্গে মাছ ধরে বেড়ালে কি হবে, ওর বেশ পড়াশুনা আছে। ওকে বরং এই স্কুলে ভর্ত্তি করে নিন, ছেলে পড়াবার জন্য। দুপুর বেলাটা তাহলে পুকুরের মাছগুলো অন্ততঃ আরামে বাঁচতে পারবে!

শশীকে নমস্কার জানাইয়া সুমিত্রা কহিল,—আপনিও দয়া করে এঁর সঙ্গে আসবেন স্কুল দেখতে।

শশী কহিল,—আসবো।

তার পর বিদায় লইয়া নিতাই, শশী এবং কাশিম প্রস্থান করিল।

—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর

সতু বাঁড়ুয্যের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া সেই পথ। সতুর রোয়াকে মজলিস জমিয়াছে। তামাকের সঙ্গে অনেকের অদৃষ্ট পোড়ানো ···এবং নাকে নস্য গোঁজার সঙ্গে নস্যাৎ করার নানা প্ল্যান চলিয়াছে। হঠাৎ শশীকে এ-পথে মাছ হাতে আসিতে দেখিয়া কয়েকজন উদর-পরায়ণের নজর টাটাইল। শিবু কহিল, তাইতো হে শশী, মাছ কোথায় পেলে?

শশী হাসিয়া কহিল,—ও-পাড়ার তাল গাছে।

—তাল গাছে মাছ! ও আবার কি কথা?

শশী কহিল,—এ মজলিসের যোগ্য কথা নয় কি? পুকুরে মাছ মেলে···তা তো বোঝেন! তবে জিজ্ঞাসা করচেন কেন?

শিবু কহিল,—জিজ্ঞাসা করার মানে, কার পুকুরে ধরলে? মাছটি দেখছি, বেশ, নেহাৎ ছোট-খাট নয়।

শশী কহিল,—তাই বলুন। কারো দয়া-দত্ত দান নিয়েও যাচ্ছি না এও বুঝচেন নিশ্চয়।···ওই খৃষ্টানী-স্কুলের কাছে মস্ত পুকুর আছে, সেই পুকুরের মাছ।

জ্ঞানশঙ্কর কহিল,—মুসলমান-পাড়া ?

শশী কহিল,—হ্যাঁ। শুধু পাড়ার মুসলমানের পুকুরের মাছ! নাকে গন্ধ গেছে, চোখেও এ-মাছ দেখলেন, জাত গেল না তো? না, আমি ধরেচি ব'লে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ-ভোজন করালে দোষ কাটবে? এই পর্য্যন্ত বলিয়া শশী হাসিল, হাসিয়া বলিল—একটু গণনা ক'রে ব'লে দেবেন, মাছটা কি জাতের? মুসলমান? না খৃষ্টান? আমার মনে হচ্ছে, মাছটা মুসলমান নয়, খৃষ্টান নয়, পরম হিন্দু! নাহলে এত বড় টিকি!

বলিয়া সে মাছ-বাঁধা লতাটুকু দেখাইল।

মজলিসে চরণ ভট্টাচার্য্যও বিরাজ করিতেছিল। সে এবারে কথা কহিল। চরণ কহিল,—সব কথায় ডেঁপোমি করা! নিষ্কর্ম্মার লক্ষণই তাই!

শশী কহিল,—কি করি বলুন, মোসাহেবি বিদ্যাটুকু আয়ত্ত করতে পারিনি, আর বাগ্দীপাড়াতেও ঘুরতে শিখিনি!

চরণ কহিল,—বাগ্দীপাড়ায় ঘুরবে কি দুঃখে, বাপু? বাড়ী আছে তো···বাড়ীতে বৃন্দাবন···দ্যাখো এবারে কি হাল করি!··· বুঝলেন সদুবাবু, এবার একটা বিহিত করুন।

শশী কহিল,—বল্ তোর সদুবাবুকে—আমি তার তাঁবেদার নই, আর তার মোসাহেবি করেও আমাকে অন্ন সংগ্রহ করতে হয় না। কি ধার ধারি সদু বাঁড়ুয্যের যে, কথায়-কথায় সদু বাঁড়ুয্যের নাম করিস্!···কথাটা বলিয়া শশী রাগে গর্-গর্ করিতে-করিতে চলিয়া গেল।

মজলিস তখন শশীর দম্ভের সমুচিত দণ্ডদানের জন্য বিবিধ উপায় আলোচনা সুরু করিল। যত তর্ক, যত আলোচনাই হোক, এটা স্থির যে, চাল কাটিলে বা ক্ষেতের ফশল নষ্ট করিলে ফলটা অত্যন্ত সুনিশ্চিত এবং প্রত্যক্ষ হয়—কিন্তু ফশ্ করিয়া আদালতে যদি ও নালিশ করিয়া বসে? ইংরেজের রাজত্ব—সমাজের সে অপ্রতিহত শক্তি এই কারণেই মুষড়াইয়া আছে! এক-ঘরে করা? তাহাতেই-বা এমন কি বাজিবে! বিবাহ দিবে, এমন একটা ভগ্নী বা কন্যা নাই। এক ভাজ—বিধবা! তার নামটাতে কালি মাখাইয়া ধূলায় লুটাইয়া জবরদস্ত শোধ লওয়া যায়, কিন্তু সেটা যদি গায়ে না মাখে! শশীর নিজের পুষ্করিণী আছে, প্রজা আছে, বাগান আছে, আর স্নান করিবার জন্য আছে গঙ্গার ঘাট। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়িয়া দিলেও শশী এবং তার ভাজ যে কোনো তোয়াক্কা রাখিবে, এমন মনে হয় না! চরণ সে পরিচয় ভালো করিয়াই পাইয়াছে। ঘোমটা দিয়া থাকিলে কি হয়, ঐ ভাজের যেমন ঝাঁজ, তেমনি তেজ! শশীকে জব্দ করিবার খুব সঙ্গিন-রকমের কোনো উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া সহু বাঁড়ুয্যের দল নিষ্ফল আক্রোশে গুমরাইতে লাগিল।

গৃহে ফিরিয়া মাছটা উঠানে ফেলিয়া শশী ডাকিল—বৌঠাকরুণ···

বিন্দু ছিল রান্নাঘরে—উনুনে আগুন দিতেছিল। শশীর আহ্বানে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল,—এই যে এসেচো! এ-যে মস্ত মাছ! একা খাবে কি করে'?

শশী কহিল—দেখো তখন, কি করে' খাই। ভাজা করো, চচ্চড়ি রাঁধো, ঝোল রাঁধো···আমি সব মাছ খাবো! ব্যাটারা একঘরে করবে বলে' শাসিয়েচে। করুক একঘরে···খাশা হবে। স্ফুর্ত্তিতে খেয়ে বাঁচবো! কাকেও মাছের একটা আঁশ দিতে হবে না।

হাসিয়া বিন্দু কহিল,—এই যে, দার্শনিক তত্ত্বও বেশ শিখেচো, দেখচি!

শশী হাসিল, হাসিয়া কহিল,—নয় বৌঠাকরুণ? বাঁচা যায় তাহলে! কাঁঠাল এলো, দে ওকে। মাছ আনলুম, দে তাকে ভাগ। কেন রে বাপু, এসেচে, নিজে তৃপ্তি করে' খাই! এক-ঘরের মজা কত, ওরা বুঝুক, আমরাও বুঝি। এবারে রোজ একটা করে' মাছ ধরে' আনবো, আর পাঁচজনকে দেখিয়ে খাবো। বুঝলে বৌঠাকরণ, মাছ আনছিলুম···দেখে শিবু গোঁসাইয়ের নোলায় জল ঝরছিল।

বিন্দু কহিল,—থামো, থামো, আর পরের কথা নিয়ে ঘোঁট করে না। মুখ-হাত ধোও, ধুয়ে কাপড় ছাড়ো। এই বৃষ্টি মাথার ওপর দিয়ে গেছে—এখন অসুখ না হলে' হয়! তুমি যাও, আমি বঁটি এনে মাছ কুটি। কুটে রান্না চাপিয়ে দি···

শশী মাছ রাখিয়া মুখ-হাত ধুইয়া ভিজা কাপড় বদ্‌লাইল; বিন্দু তখন মাছ কোটায় ব্যস্ত! শশী কহিল,—একবার ঘুরে আসি বৌঠাকরুণ···

বিন্দু কহিল,—কোথায় যাওয়া হবে, শুনি···

শশী কহিল,—নিতাইয়ের কাছে। আজ এক মজা হয়েছে বৌঠাকরুণ···পাদ্রীরা একটা স্কুল খুলেচে না সেই মুসলমান-পাড়ার ওদিকে ?

বিন্দু কহিল—হ্যাঁ, সেবার ওলাবিবির-তলায় যেতে দেখচি বটে !

শশী কহিল,—আজ সেই স্কুল দেখে এলুম। একটি বাঙালী-মেয়ে সেই স্কুলের কর্ত্তা নয়, কর্ত্রী। অর্থাৎ স্কুল দেখাশুনার ভার তাঁর উপর। মেয়েটি খৃষ্টান নয় দেখে এমন আনন্দ হলো ! আমাদের বাঙালীর মেয়ে···খালি রান্নাবান্না, বাটনা-বাটায় মত্ত না থেকে এত বড় কাজ করচে, যে-কাজে অনেক পুরুষ এগুতে ভয় পায় ! বাঙালীর মেয়ের এ-মূর্ত্তি···সত্যি বলচি বৌঠাকরুণ, আমাদের শাস্ত্রে বিদ্যার দেবতাকে যে মেয়ে-মানুষ বলা হয়েচে, সে খুব ঠিক ! অত দরদ করে' মমতা করে' কে বিদ্যা শেখাতে পারে ? মেয়েটিকে দেখে শাস্ত্রকারের তৈরী দেবী-বীণাপাণির স্তবটুকু মনে পড়ছিল···যা শুভ্র-বস্ত্রাবৃতা, যা বীণা-বরদণ্ডমণ্ডিত-ভুজা, যা শ্বেত-পদ্মাসীনা ! তাঁকে দেখে আমার কেবলি মনে হচ্ছিল, তিনি বসেন নি চেয়ারে—মেয়েটি যেন শ্বেত-পদ্মে বিরাজ করচেন !

বিন্দু কহিল,—সত্যি ?

শশী কহিল,—সত্যি বৌঠাকরুণ ! দ্যাখো, ছোট ছেলেকে মা যখন হাতে-খড়ি দিয়ে ক-খ শেখান, তখন ছেলে কত সহজে শেখে ! কিন্তু তারপর যেই পণ্ডিতের হাতে পড়ার ভার পড়ে,

অমনি সেই ছেলে ফাঁকির ফন্দী আবিষ্কারে মাথা খাটাতে লেগে যায়! আমার মনে হয়, স্কুলে ছোট ছেলেদের পড়ানোর ভার যদি মেয়েদের হাতে দেওয়া হয়, ঐ গুঁপো মাষ্টার-পণ্ডিতদের তাড়িয়ে, তাহলে' ঢের ভালো হয়। পুরুষ মাষ্টার শুধু শাসন করতে জানে। ছেলেদের আব্দার মেনে দরদে-স্নেহে তাকে পড়া শেখাতে পারে শুধু মেয়েমানুষ! এক তো ধৈর্য্য না থাকলে সম্ভব নয়—পুরুষ চিরদিন ধৈর্য্য-হারা! ধৈর্য্য যা, তা আছে শুধু মেয়ে-মানুষের!···

বিন্দু মৃদু হাসিল—তার মনে হইল, তার নিজের কথা! এই যে, সংসারে কি তার কাজ! রান্নাবান্না আর ঘর-সংসার দেখা। কতটুকু সময় বা! তারপর দিনের দীর্ঘ অবসর! সে যে কি করিয়া কাটে! এ সময়টায় দুই-চারিজন ছেলে-মেয়েকে লইয়া যদি তাহাদের পড়াইতে পারিত, তাহাদের হাসি-খেলা-ধুলায় সঙ্গ দিয়া মানুষ করিয়া তুলিবার কাজ পাইত!

শশী কহিল,—তুমি ভাবচো, মেয়েটি খৃষ্টান? মোটেই নয়। আমরাও তাই ভাবতুম। কিন্তু তিনি বললেন, তিনি খৃষ্টান নন্। অনাথা,—ছেলেবেলায় বাপ-মা হারিয়ে পাদ্রীদের ঘরে মানুষ হয়েচেন, লেখাপড়া শিখেচেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো কি না —তাই শুনলুম। একদিন তাঁর স্কুল দেখতে যেতে বলেচেন···

বিন্দু কহিল,—যেয়ো। আর ফিরে এসে আমাকে তাঁর কথা বলো।

শশী কহিল,—নিশ্চয় বলবো।···তাহলে' ঘুরে আসি···

বিন্দু কহিল,—শীগ্‌গির ফিরো ভাই। একলাটি থাকি···

শশী কহিল,—এখনি ফিরবো।

শশী চলিয়া গেল এবং বিন্দু মাছ কুটিয়া রান্না চড়াইয়া দাওয়ায় আসিয়া বসিল। দাওয়ায় একটা আলো জ্বলিতেছিল। আলোর সামনে সে একখানা বই খুলিয়া বসিল।

কতক্ষণ বই পড়িতেছে···হঠাৎ একটা শব্দে চমকিয়া চাহিয়া বিন্দু ভাখে, উঠানে একটা ছায়া পড়িয়াছে। মানুষের ছায়া। বিন্দু সভয়ে প্রশ্ন করিল,—কে?

ছায়া নড়িল না। বিন্দু উঠিল। দাওয়ার এককোণে একটা লাঠি ছিল। লাঠিটি তার স্বামীর। সেই লাঠি হাতে লইয়া বিন্দু উঠানে নামিল,—গা একবার ছম্‌-ছম্‌ করিয়া উঠিল। ভয়ে! সে ভয় দাবিয়া বিন্দু কহিল,—কে? জবাব দাও।

তবু কোনো সাড়া নাই,—ছায়া নিশ্চল। বিন্দু তখন আর-একটু অগ্রসর হইল, কহিল,—জবাব না দিলে আমি এখনি চ্যাঁচাবো। বলো, কে ··?

ছায়া এবার নড়িল। বিন্দু লক্ষ্য করিয়া ভাখে, উঠানে বড় চাঁপা গাছের আড়ালে একজন মানুষ। সে চমকিয়া উঠিল, তারপর কহিল,—কে তুমি ?···

কথার সঙ্গে-সঙ্গে হাতের লাঠি উদ্যত করিয়া ধরিল এবং মনুষ্য-মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া সজোরে লাঠি চালাইল।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা আর্ত্তনাদ তুলিয়া মূর্ত্তি ভূলুণ্ঠিত হইল। আকাশে ক্ষীণ চন্দ্রালোক—সে-আলোয় ভালো কিছু লক্ষ্য হয়

না। তাড়াতাড়ি আলো আনিয়া বিন্দু দ্যাখে, লোকটা পড়িয়া আছে!

ভয়ে তার আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। ঘটিতে জল লইয়া সে তার মুখে-চোখে দিল। লোকটা চোখ মেলিয়া চাহিল। চোখে বক্র কটাক্ষ। সর্ব্বনাশ—কে এ? কাহাকেই-বা সে এখন ডাকে? পাড়ার কাহাকেও ডাকিলে কেহ আসিবে না—মাঝে হইতে···

কি করা যায়? শশীর উপর রাগ হইল। এত রাত্রি হইতে চলিল, তবু তার গল্প আর শেষ হয় না! বাহির হইলে ঘরের কথা এমনি ভুলিয়া থাকিতে হয়!···

তবু উপায় যখন নাই, তখন ভয়ে নিশ্চল থাকিলেও তো চলিবে না! ভগবানকে স্মরণ করিয়া লোকটার পানে চাহিয়া সুদৃঢ়-কণ্ঠে সে কহিল,—চোর! এখনো পড়ে' আছো! চলে' যাও এখনি···

লোকটা কাতর ভাব দেখাইয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিল,—আমার পায়ে চোট্ লেগেচে। উঠতে পারচি না।

বিন্দু কহিল,—যেমন কোরে পারো, যাও। না হলে' এখনি লোক ডাকবো। শেষে থানায় যেতে হবে!

লোকটা কহিল,—আমায় ধরে' যদি একটু তুলে দাও, তাহলে' চলে' যাই। পুলিশে দিয়ো না—দোহাই!

এ-কথায় বিন্দুর মমতা জাগিল। সে তার হাত ধরিয়া টানিয়া তাকে উঠাইল। লোকটা উঠিয়া গায়ের কাদা

ঝাড়িতেছে, এমন সময় বাহির হইতে কে হাঁকিল,—শশী আছো ?

চরণ ভট্টাচার্য্যের গলা। বিন্দুর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। এক আপদ না যাইতে···

চকিতে চরণ আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল, তার পিছনে সদু বাঁড়ুয্যে, শিবু গোঁসাই প্রভৃতি।

বিন্দু সসঙ্কোচে দূরে সরিয়া গেল। চরণ কহিল,—কে তুমি, বাপু ?

লোকটা কহিল,—আজ্ঞে, আমি এঁদের আপনার লোক···

এইটুকু বলিয়াই সে কোনোমতে একটু অন্তরাল সংগ্রহ করিয়া সরিয়া পড়িল।

বিন্দু অবাক ! এইমাত্র যে উঠিতে পারিতেছিল না, সে এমন ফশ্ করিয়া ছুটিয়া পলাইল—আর ও কি কথা বলিয়া ! তবে কি···

এ যে কি, তাহাও তার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইল চরণের পরের কথায় !

চরণ কহিল,—দেখ্‌লেন সকলে ! আমি স্বচক্ষে দেখেচি, শশী চ'লে গেল, আর তার পরেই ঐ লোকটা ফশ্ ক'রে বাড়ীতে ঢুকলো ! তাই আপনাদের খপর দিলুম। হুঁ ! আমি চরণ ভট্চাজ্—দু'বেলা সন্ধ্যাহ্নিক না করে' জল গ্রহণ করি না—আমায় অপমান ! আমায় মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা !

সদু বাঁড়ুয্যের দল সমস্বরে কহিল,—এ তো ভালো

কথা নয়···ক্ষেত্তর আমাদের কি মানুষ ছিল। আর তার বিধবার এই রীত···গাঁয়ের বুকে বসে'! আস্পর্দ্ধা কম নয়!

কথায় কথা বাড়িয়া উঠিতেছিল! এবং চরণের ইতর ইঙ্গিত-ভরা টিপ্পনীর সঙ্গে সে-সব কথা এমন জটিল ও দুঃসহ হইয়া উঠিল যে, বিন্দু সে-কথার আঘাত সহ্য করিতে পারিল না। চোখের সামনে হইতে লণ্ঠনের আলো, আকাশের ঐ ক্ষীণ জ্যোৎস্না দপ্ করিয়া নিবিয়া সমস্ত পৃথিবীকে কখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া দিল! সে কম্পিত দেহে রোয়াকের পাশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

ঠিক এমনি সময়ে শশী আসিয়া গৃহে ঢুকিল। উঠানে ভিড় দেখিয়া সে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইল। পরে যখন দেখিল, সে-ভিড় জমাইয়াছে চরণ ভট্টাচার্য্য ও সতু বাঁড়ুয্যের দল, তখন রাগে জ্বলিয়া সে চীৎকার তুলিল,—আমার বাড়ী ঢুকেচো কোন্ সাহসে? বেরোও, এখনি বেরোও,—নাহলে' সব খুন করবো।

নিজের দেহকে একেবারে সঙ্কুচিত করিয়া চরণ চাঁপাগাছের অন্তরালে সড়িয়া পড়িল। সতু কহিল,—কি মিছে চ্যাঁচামেচি করচো, পাগলের মতো! তোমার ভাজের ব্যবহার ক্রমশঃ যে অসহ্য হয়ে উঠলো,—সে খপর রাখো?

শশী কহিল,—আমার ভাজ···তাঁর খপর আমি রাখবো। তোমাদের সে খপরের জন্য মাথা-ব্যথা কিসের?

শিবু কহিল,—তুমি বাড়ী নেই, সে-সময় অপর অচেনা পুরুষ এসে তোমার ভাজের সঙ্গে আলাপ করবে, এই-বা গ্রামে থেকে আমরা সহ্য করবো কেন?

শশী হুঙ্কার তুলিল,—কি ! এত বড় কথা !

জ্ঞান কহিল,—কিসের চোখ রাঙাও ! লোক-জন ডেকে আলাপ করার সখ যদি তাঁর হয় তো গ্রামের বাইরে চলে যান। এখানে আমরা এ-সব বরদাস্ত করবো না। এতে থানা-পুলিশ করতে হয়, স্বীকার !

বাড়ী-চড়া হইয়া এভাবে অপমান ! শশী কহিল,—আমার আপনার লোক যা-খুশী করবে, তোদের কি ? বেরো সব বলচি—নাহলে' মাথা ফাটিয়ে দেবো···বলিয়া সে পাগলের মতো লাঠি-গাছটা কুড়াইয়া রণরঙ্গে নাচিয়া উঠিল ! তার সে রুদ্র-মূর্ত্তি দেখিয়া সন্তুর দল ভয় পাইল এবং বিনা বাক্য-ব্যয়ে দ্রুত অপসৃত হইল।

তারা চলিয়া গেলে শশী রোয়াকের দিকে ফিরিয়া ছাখে, বিন্দু মূর্চ্ছিতার মতো পড়িয়া আছে। এরা কি কোনো অত্যাচার করিয়া গিয়াছে ? উঠানে দাদার লাঠি, ওধারে জলের ঘটী পড়িয়া···ব্যাপার কি ? শশী তাড়াতাড়ি বিন্দুর কাছে আসিয়া ডাকিল,—বৌঠাকরুণ···

বিন্দু চোখ মেলিয়া চাহিল, অতি ক্ষীণ স্বরে কহিল,—ঠাকুরপো !

বিন্দুকে ধরিয়া শশী ধীরে-ধীরে তুলিল। বিন্দু বসিল। কিন্তু এ কি চেহারা বিন্দুর ! যেন কতকাল আহার নাই, কত দীর্ঘ দিন যেন মস্ত রোগে ভুগিয়াছে ! চোখে-মুখে তেমনি কালির রেখা !

শশী কহিল,—কি হয়েছিল বৌঠাকরুণ ?

লজ্জায় ঘৃণায় দুঃখে বিন্দুর যেন চেতনা ছিল না! অতি-কষ্টে শশীর পানে চাহিয়া ভগ্ন হতাশ কণ্ঠস্বরে সে কহিল,—বলচি… আমায় নিয়ে চলো ঠাকুরপো!

বিন্দুকে ধরিয়া শশী রোয়াকে আনিয়া বসাইল। তারপর উদ্বেগের উত্তেজনায় ঘুরিয়া বেড়াইল।

বহুক্ষণ পরে বিন্দু ডাকিল—ঠাকুরপো…

শশী কাছে আসিলে বিন্দু ধীরে-ধীরে সব কথা খুলিয়া বলিল! শুনিয়া শশী রাগে ফুলিয়া উঠিল,—এবার শশী বামুনকে ওরা দেখবে,—পড়ে-পড়ে' থ্যাংলানি খাবো, খেয়ে পালাবো বা দম্‌বো, এমন শর্ম্মা আমি নই! ঐ যত ব্যাটা গোঁড়াকে পা দিয়ে চেপে একবার ভালো করে' জানাবো, শশী বামুনের শক্তি কতখানি!—ঐ চরুণে ব্যাটা…ফাঁসি-কাঠে ঝুলি যদি, সেও আচ্ছা, ওকে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবো—ওর বামনাগিরির শ্রাদ্ধ করবো তবে ছাড়বো!

বিন্দু কহিল,—শোনো ঠাকুরপো, ও-সব পাগলামি ছাড়ো ভাই। তুমি একা, ওরা অত লোক! কি তুমি করবে? শেষে তোমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি ঘটে যদি? ওদের অসাধ্য কাজ নেই।

এক অজানা আতঙ্কে বিন্দুর সর্ব্ব-শরীর শিহরিয়া উঠিল।

শশী কহিল,—তুমি কোনো ভয় করো না। বাড়ীতে আমি ছিলুম না বলেই ওদের ছাতি অতখানি ফুলেছিল! আমি বাড়ী ঢুকতেই ছুঁচোর মত সরে' গেল! ওদের বড়াই শুধু দুর্ব্বল

মেয়ে-মানুষের সামনে!...আচ্ছা, যে-লোকটা প্রথমে ঢোকে, তাকে তুমি চিনতে পারো?

বিন্দু কহিল,—না।

শশী প্রশ্ন করিল,—দেখতে কেমন?

বিন্দু কহিল,—তা কি দেখেচি লক্ষ্য করে'? চোর ভেবে ভয়েই আমি সারা! তবু সাহস করে' লাঠি নিয়ে এগিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম, তোমার দাদার লাঠি! তাই কেমন বল পেয়েছিলুম। নাহলে' আমার সাহস তো জানো, চোরের নামে ভয়ে অজ্ঞান হই।

শশী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—লাঠি তার গায়ে লেগেছিল?

বিন্দু কহিল,—পায়ে লেগেছিল।

শশী কহিল,—তার চেহারা একেবারে লক্ষ্য করোনি?

বিন্দু কহিল,—মাথায় কোঁকড়ানো চুল, চোখের নীচে কালি, খোঁচা দাড়ি, আর গালে সুপুরির মত একটা কালো জড়ুল!

শশী কি ভাবিল, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—হুঁ। ওদের দলের কেউ। আমি সন্ধান নিচ্ছি। দেখি, তার বুকের পাটা কত বড়!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিজলী

সুমিত্রা গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। স্কুল হইতে সোজা পথ গিয়াছে গঙ্গার ধারে। গঙ্গার ধারে কয়েকটা ইট-খোলা। ইট-খোলার পাশ দিয়া সে আসিয়া জেটিতে উঠিল।

ফুলছড়িতে একটা কটন্ মিলও আছে—মিড্ল্যাণ্ড কটন্ মিল। এ জেটিটি সেই মিলের সংলগ্ন। নদীর লাল ঘোলা জল বৃষ্টির পর শান্ত স্রোতে বহিয়া চলিয়াছে। নদীর বুকে ক'খানা নৌকা। ভূতের মতো ক'জন লোক সে নৌকায় বসিয়া ইলিশ-মাছ ধরিতেছে।

সুমিত্রা জেটিতে আসিয়া জলের ধারে পা ঝুলাইয়া বসিল। জলের অগাধ প্রসার···মন তার কোন্ অজানা অসীমে ছুটিল।

সাম্‌নে ভবিষ্যৎ···তারো এমনি প্রসার। জীবনে তার চাহিবার কি আছে? এই ছেলেদের লইয়া খেলাধূলা করা, যতটুকু সাধ্য জ্ঞানের বাতি ধরিয়া এইসব অবহেলিত বালক-বালিকার চিত্তে আলো জ্বালিয়া তাদের জীবনে যতটুকু পারে অস্পষ্টতার

মাঝে আলো ধরিয়া দেওয়া···এ যে কত বড় কাজ! এরা যখন লেখা-পড়া শিখিয়া মানুষ হইবে, ইতর অবোলা পশুর মতো পরের সর্ব্বপ্রকার দাসত্ব শিরোধার্য্য করিয়া শুধু দু'মুঠা অন্নের সংস্থান হইলেই কৃতার্থ হইবে না! জীবনের অর্থ বুঝিয়া বিরাট কর্ম্ম-শালায় আপনাদের শক্তি নিয়োজিত করিবে···সে শুভ উজ্জ্বল সুন্দর ভবিষ্যৎকে কল্পনার চোখে দেখিয়া সুমিত্রা কি তৃপ্তি যে অনুভব করিল! কল্পনায় সে রঙীন ছবি দেখিয়া তার মুখ-চোখ সম্বিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ পিছন হইতে কে ডাকিল,—সুমি···

চমকিয়া ফিরিয়া সুমিত্রা ছাখে, পিছনে বিজলী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুমিত্রা উঠিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া কহিল—তুমি···

বিজলী হাসিয়া জবাব দিল,—হ্যাঁ। তুমি ভাবনায় এমন তন্ময় যে, আমি এসে দাঁড়িয়েচি, জানতেও পারো নি!···কি ভাবছিলে?

সুমিত্রা কহিল,—কত কি···

বিজলী অগ্রসর হইয়া সস্নেহে সুমিত্রার হাতখানি নিজের হাতে ধরিয়া কহিল,—কি ভাবছিলে, সুমি?

সুমিত্রা কহিল,—আমার স্কুলের কথা। ভাবছিলুম, এই যে ছেলেরা লেখাপড়া করচে, এরা যদি সত্যকার মানুষ হয়ে ওঠে কোনো দিন···জীবনের মর্ম্ম বা লক্ষ্য পুরুষানুক্রমে যারা বোঝেনি ···কি চমৎকার সে হবে!

বিজলী কহিল,—তোমার এ পরিশ্রম কখনো নিষ্ফল হবে না, সুমি। তোমার হাতে সেই রূপকথার সোনার কাঠি আছে। তুমি জানো না, সে সোনার কাঠির ছোঁয়া যে পাবে, মানুষ তাকে হতেই হবে।

সুমিত্রা বলিল—ও-সব কথা যাক্। তুমি আজ এই সন্ধ্যার সময় এখানে হঠাৎ?

বিজলী কহিল,—নেহাৎ হঠাৎ নয়! রাটার সাহেব দেখা করতে বলেছিল তাই এসেচি!

সুমিত্রা কহিল,—রাটার সাহেব?

বিজলী কহিল,—ওপারে যে পাটের কল আছে, তারি বড় সাহেব রাটার। সে আজ আমাকে আসতে বলেছিল…

এই অবধি বলিয়া বিজলী একবার থামিল, থামিয়া পরক্ষণে কহিল,—ওই মিলে আমি চাকরির চেষ্টা করছিলুম। গাওয়ার সাহেব চিঠি দিয়েছিল…

সুমিত্রা কহিল,—তুমি তাহলে' ইস্কুলের কাজ ছেড়ে দিচ্ছ?

বিজলী কহিল,—হ্যাঁ। তাতে ভবিষ্যত উন্নতির কি সম্ভাবনা আছে? স্কুল-মাষ্টারী করে' কাটাবার জন্যই কি দুর্লভ নর-জন্ম গ্রহণ করেচি, সুমি? তার চেয়ে ঐ পাটের কলে ঢুকতে পেলে একদিন লক্ষপতি হবার সম্ভাবনা!

সুমিত্রা কহিল,—এ কি ভালো হলো?

বিজলী কহিল,—খুব ভালো। এই যে জীবনকে উপভোগ্য করবার জন্য চারিদিকে বিচিত্র আয়োজন পড়ে' রয়েচে, পয়সা

না থাকলে তার কোনোটাকে আয়ত্ত করা যাবে না। খাওয়া-পরা নিয়ে মত্ত থাকলেই তো চলবে না! সে খাওয়া-পরার মধ্যে বৈচিত্র্য চাই। তাছাড়া ভালো বাড়ী, মোটর, দাস-দাসী ···এ-সবের কল্পনা করার শক্তিও ক্রমে লোপ পেয়ে যাবে সুমি, স্কুলে মাষ্টারি করতে-করতে! জীবনকে আমি উপভোগ করতে চাই—শুধু বোঝার মতো বয়ে বেড়ানো নয়।

এ-কথায় সুমিত্রার আজন্মের সংস্কারে বেশ আঘাত লাগিল। সে স্তব্ধ হইয়া বিজলীর পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ সেই বিজলী! অনাথ অসহায় দেখিয়া পাদ্রী সাহেব যাকে বুকে তুলিয়া নিজের গৃহে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন! সে-আশ্রয় না পাইলে কোথায় কি-দশায় যে সে থাকিত, তার কোনো ঠিকানা নাই! পাদ্রী সাহেব কতদিন বলিয়াছেন,—তোমরা ত্ব'জনে শিক্ষা-দানকেই জীবনের ব্রত করিয়ো। ভারতবর্ষে শিক্ষার বড় অভাব। এই শিক্ষার অভাবে দারিদ্র্য আর মৃত্যু এত-বড় জাতিটাকে নষ্ট করিয়া দিতেছে, জীর্ণ কঙ্কালে পরিণত করিতেছে!

সুমিত্রা কোনো কথা না বলিয়া বিজলীর পানে চাহিয়া রহিল। কহিল,—কি দেখচো?

সুমিত্রা কহিল,—এর মধ্যে তুমি এতখানি বৈষয়িক হয়ে উঠেচো···তাই দেখচি।

বিজলী কহিল,—বৈষয়িক কথাটা ঠিক খাটে কি? তা নয়। যখন মানুষ হয়ে জন্মেচি, তখন মানুষের মতো বাস করতে চাই।

সুমিত্রা কহিল,—বিলাসিতা না হলে' কি মানুষের মতো বাস করা যায় না? মানুষ আর বড়-মানুষ···দুটো এক বস্তু নয়।

বিজলী হাসিল; হাসিয়া কহিল,—তোমার কথার মানে ঠিক বুঝতে পারলুম না।'

সুমিত্রা কহিল,—ফাদারের কাছে যে-প্রতিশ্রুতি···'

বিজলী কহিল,—প্রতিশ্রুতি আবার দিলুম কবে?

সুমিত্রা কহিল,—কথায় না দিই, তাঁর ইচ্ছা ছিল···

বাধা দিয়া বিজলী কহিল,—জানি। কিন্তু শক্তি থাকতে দারিদ্র্য বরণ করবো কেন? এখন একলা আছি। যদি বিবাহ করি···যদি কেন? বিবাহ তো করবো একদিন। একটা সংসার গড়ে তুলবো। সে-সংসারের সব ভার, সব দায়িত্ব বহন করবার যোগ্যতা থাকা চাই। সে যোগ্যতা অর্জ্জন না করে' বাহিরের কটি প্রাণীকে এনে সংসার গড়বার চেষ্টায় তাদের উপর অবিচারই প্রকাশ পাবে সুমি।···সংসারে একা থাকার সাধ আর যার থাকে, থাক্, আমি নিঃসঙ্গ জীবনের পক্ষপাতী নই। কাজেই আর্থিক অবস্থা ভালো করা চাই। আর্থিক অবস্থা ভালো হলে' শুধু নিজের নয়···আরো পাঁচজনের অনেক উপকার!

বিজলী সুমিত্রার পানে দীপ্ত নেত্রে চাহিল। সুমিত্রা বিজলীর পানেই চাহিয়া ছিল। দু'জনের দৃষ্টি মিলিতে বিজলী হাসিল; হাসিয়া কহিল,—জানো তো সুমি, এ মনে কি আশা বয়ে আসচি···জীবনের পথে পা দেওয়া ইস্তক···

সুমিত্রার দৃষ্টিতে প্রশ্ন জাগিল। বিজলী তাহা লক্ষ্য করিল; করিয়া কহিল,—তোমায় নিয়ে যে সংসার পাতবো, সে সংসার বইবার যোগ্যতা থাকা চাই···তোমার স্বাচ্ছন্দ্যে না বাধে কোথাও!

সুমিত্রার মুখের উপর কে যেন অতর্কিতে আঘাত করিল। লজ্জায় সে মুখ নামাইল। তার কর্ণ-মূল অবধি লজ্জায় রাঙা, তপ্ত হইয়া উঠিল।

বিজলী কহিল,—আমার এ আশা কি দুরাশা, সুমি? কথাটা বলিয়া সে সুমিত্রার হাত ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল।

সুমিত্রা দু'পা সরিয়া গিয়া কহিল,—তা ভেবে দেখিনি কখনো।···ও কথা থাকুক।

এই অবধি বলিয়া সে অন্য কথা পাড়িল, কহিল,—এই স্কুলের কাজ আমার এত ভালো লাগচে যে, এ-কাজ ফেলে আর কোনো দিকে আমি মন দিতে কখনো পারবো কি না, জানি না।···

কথাটা বলিয়া সুমিত্রা শূন্য আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। বুঝি, তার চোখের সম্মুখে ভবিষ্যতের সে অপরূপ ছবি ফুটিয়া উঠিতেছিল!

বিজলী কহিল,—কিন্তু তাতেই জীবনের সার্থকতা নয়, সুমি! একটা গৃহ, সংসার পেতে বসা···তাতে প্রচুর আনন্দ। এ কাজ হয়তো কালে নীরস প্রাণহীন হবে একদিন—কিন্তু যে-কাজে স্নেহের স্পর্শ, সে-কাজ কখনো বিরস হবার নয়।

সুমিত্রা কহিল,—এর মধ্যে স্নেহের অভাব দেখলে কোথায়? এই সব ছেলেমেয়েদের নিয়ে একসঙ্গে বাস করে' স্নেহের অভাব কোনো দিন বোধ করবো না।

বিজলী কহিল,—যাক্, ও নিয়ে এখন তর্ক তুলতে চাই না। যদি কোনো দিন যোগ্যতা অর্জ্জন করতে পারি, সেদিন আমার প্রার্থনা নিয়ে তোমার দোরে এসে দাঁড়াবো। আমাদের জীবন এক সঙ্গে বেড়ে উঠেচে···এর মধ্যে ভগবানের কি কোনো ইঙ্গিত নেই, ভাবো?

সুমিত্রা কহিল,—ও কথা থাক্। এখন তোমার কাজের কথা বলো। রাটার সাহেবের কাছে গিয়েছিলে?

বিজলী কহিল,—গিয়েছিলুম। সাহেব নিতে রাজী। কেনই-বা নেবে না? একে মিশনারীদের কাছে মানুষ হয়েচি, তার উপর গাওয়ার সাহেবের সুপারিশ। সাহেব আমায় এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার করবে। আপাততঃ দুশো টাকা মাহিনা। মাহিনা যাই হোক্—অন্য পাঁচ রকমে রোজগার আছে বিলক্ষণ। সাহেব নিজেও সে-কথা বললে।

কথাটা বলিয়া বিজলী হাসিল। সুমিত্রা বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে বিজলীর পানে চাহিয়া রহিল।

বিজলী কহিল,—কি ভাবচো?

সুমিত্রা কহিল,—আরো পাঁচ রকমের মানে? ঘুষ? বে-আইনী রোজগার?

বিজলী কহিল—বাইবেল মানলে সেই অর্থ দাঁড়ায়। কিন্তু

ব্যবহারে এটা ন্যায়-সঙ্গত দাঁড়িয়েচে। মনিব মিলওয়ালা তা জানে। আর তা জানে বলেই মাহিনার হার দু'শোর উর্দ্ধে ওঠে না। সাঁহেব স্পষ্ট বললে, দুশো টাকা মাহিনা হলে' কি হয়, বুদ্ধি থাকলে মাসে হাজার দেড়-হাজার টাকা রোজগার করতে পারবে।' তবে হুঁশিয়ার, কোম্পানিকে বাঁচিয়ে চলা চাই। তাহলে নিজেও বাঁচতে পারবে।

ধিক্কারে সুমিত্রার মন ভরিয়া উঠিল। সুমিত্রা কহিল,—ছি! লেখাপড়া শিখে এ-কথা এমন অনায়াসে বলচো কি করে'?

বিজলী কহিল—তোমার পুঁথি-গত জীবনেই তুমি চিরদিন বদ্ধ রইলে সুমিত্রা! সংসারকে লোকে কর্ম্মক্ষেত্র বলে, কেন? কর্ম্মক্ষেত্রে নামলে পুঁথির বুদ্ধিকে বহু কাট-ছাঁট করতে হয়—নাহলে জীবন হয় গড্ডলিকা-প্রবাহে ভেসে চলে, নয়তো জীবন-স্রোতে পঙ্গুতা আসে।··· মানুষ জড় পুতুল হয়ে দাঁড়ায়!

সুমিত্রা কহিল,—তোমার এ ফিলজফি আমি গ্রহণ করতে পারবো না, বিজলী!

বিজলী কহিল—ইস্কুলে ফিরবে?

সুচিত্রা কহিল,—একটু পরে ফিরবো।

বিজলী কহিল,—আচ্ছা, আমি আসি। আমার একটু কাজ আছে। চাকরিতে বাহাল হই, তারপর একদিন এসে দেখা করবো।

বিজলী চলিয়া গেল। সুমিত্রা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—দৃষ্টি তার শূন্যে নিবদ্ধ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পিঞ্জর-পর্ব্ব

গৃহের সম্মুখে উঠানে একটা কাঠের টুলে নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া আছে। প্রভাত-সূর্য্য পেয়ারা গাছের পত্রান্তরাল-পথে অজস্র কিরণ বর্ষণ করিতেছে। নিতাইয়ের পায়ের কাছে পরিষ্কার চাঁছা কতকগুলা বাঁখারি।

কাশিম আসিয়া কহিল—কঞ্চি এনেচি।

নিতাই কহিল,—রেখে দে।

কাশিম কহিল,—ময়নাটা কোথায় রাখবো? খাঁচা যে এখনি চাই।

কাল ঝড়ের মুখে একটা ময়না পাখী কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া দাওয়ার উপর পড়িয়াছিল—একেবারে মূর্চ্ছিত দেহে! বহু যত্নে সেবায় পরিচর্য্যায় কাশিম তাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছে। ভোরে উঠিয়া নিতাই আর কাশিম তুজনে বাঁখারি চাঁচিয়াছে, ময়নার খাঁচা তৈয়ার করিবে বলিয়া। কাশিম গিয়াছিল নিতাইয়ের কথায় কঞ্চি-সংগ্রহে। ইতিমধ্যে নিতাইয়ের এই ভাবান্তর!

হঠাৎ নিতাইয়ের ঔদাস্য দেখিয়া কাশিম বিস্মিত হইল। সে কহিল—খাঁচা হবে না?

নিতাই কহিল,—হবে'খন! হঠাৎ একটা কথা মাথায় এলো রে কাশি।

—কি কথা?

নিতাই কহিল,—কাল ঐ ইস্কুল দেখলি তো?

কাশিম কহিল,—দেখেচি!

নিতাই কহিল,—বেশ ইস্কুল। পণ্ডিতের জলবিছুটি নেই, বেত নেই। কি আদরে, কি যত্নে লেখাপড়া শেখাচ্ছে ঐ গরীব ছেলেদের···

কাশিম হাঁ করিয়া নিতাইয়ের পানে চাহিয়া রহিল।

নিতাই কহিল,—আমাদের ধর্ম্মে লেখাপড়ার যিনি মালিক —যাঁর দয়ায় মানুষ লেখাপড়া শেখে, তিনিও মেয়ে-মানুষ। তাঁর নাম জানিস?

কাশিম কহিল—না।

নিতাই কহিল,—তুই একেবারে গাধা। দেখিসনে সেই শীতকালে ওপাড়ার মাঠে বারোয়ারি করে' পূজো হলো···সরস্বতী-পূজো? সেই যে রে, রাশ-রাশ গাঁদা ফুলের মালা···

কাশিমের মনে পড়িল সেই আনন্দ-দীপ্ত উৎসব! সে কহিল,—হ্যাঁ···

নিতাই কহিল,—সেই সরস্বতী ঠাকুর হলেন লেখাপড়ার দেবতা। ঐ ইস্কুলে সেই দেবতাকেই কাল দেখে এসেচি।

কথার মর্ম্ম কাশিম ঠিক বুঝিতে পারিল না।

নিতাই কহিল,—মেয়েদের কাছে লেখাপড়া শিখলে ভালো

করে' শেখা যায়। তারা বিদ্যেতে ভয় ধরিয়ে দেয় না। তাই ভাবছিলুম, তোর দিনগুলো হেইয়ো-হেইয়ো করেই কাটচে। এ তো ঠিক নয়। তুই লেখাপড়া শেখ, পরে ভালো হবে।

কাশিম নিরুত্তর রহিল।

নিতাই কহিল,—ওই ইস্কুলে তোকে পড়তে পাঠাবো ভাবচি। জাত যাবে বলে' ভয়ে কেউ শিউরে উঠবে না, তোকে কেউ দূর-ছাইও করবে না ওখানে। পড়বি ভালো। পড়াশুনা করে' এর পর মানুষ হতে পারবি—নিজের হাতে বোট ঠেলে দিন কাটাতে হবে না।

কথাটা কাশিমের মন্দ লাগিল না। বেশ একটি বড় দল ...কত খেলা-ধূলার ব্যবস্থা আছে। ঐ যে মাঠের দু'ধারে কাঠ পোঁতা...ছেলেরা বল খেলে। তার উপর বাঙালী মেমের আদর করিয়া কত-কি খাওয়ানো! তিনিও তো স্কুলে পড়ার কথা বলিলেন!

সস্মিত মুখে কাশিম কহিল,—আমি পড়বো।

নিতাই কহিল,—পড়বি তো নিশ্চয়। তবে ভাবচি, ওখানেই থাকবি, না, বাড়ী থেকে রোজ ইস্কুলে যাবি!

এ দুটার মধ্যে কোন্‌টা ভালো, কাশিমের বুঝিবার শক্তি নাই। কাজেই নিতাইয়ের পানে নিরুত্তরে সে চাহিয়া রহিল। নিতাইও সেই কথা ভাবিতেছিল।

এমন সময় দ্বারে শশীর গলা শুনা গেল। শশী কহিল,—নিতাই আছো?

নিতাই যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল···এ-আহ্বানে সহসা জাগিয়া সে দ্বার-প্রান্তে চাহিল। শশী ততক্ষণে চৌকাঠ ছাড়াইয়া উঠানে পা দিয়াছে। নিতাই কহিল—এসো শশীদা। কি খপর?

শশী কহিল,—খপর গুরুতর,—তাই এসেচি। তোমাকে এর বিহিত করতে হবে ভাই। আমি একা···আমার দোসর চাই এ-ব্যাপারে।

শশীর স্বরে উত্তেজনা। নিতাই বেশ একটু বিস্ময় বোধ করিল। নিতাই কহিল,—কি ব্যাপার, বলো তো? কাশিমকে সে আদেশ করিল,—আর একটা টুল এনে দে রে, কাশি···

কাশিম ছুটিল টুল আনিতে। নিতাই কহিল—তোমার মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছে···

কথা শেষ হইল না। শশী কহিল—গুরুতর ব্যাপার, বললুম তো!

কাশিম টুল আনিয়া দিলে শশী বসিল। বসিয়া কালিকার ঘটনা নিতাইকে খুলিয়া বলিল। শুনিয়া নিতাই একেবারে লাফাইয়া উঠিল, কহিল—বলো কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা!

শশী কহিল—থানায় যেতে পারতুম—কিন্তু ওদের পয়সার জোর আছে, তাছাড়া দলে ভারী।

নিতাই কহিল—থানা কিসের! আমরা ও ছুঁচোগুলোকে শিক্ষা দিতে পারি না—নিজেরা?

এ-কথায় শশীর উৎসাহ বাড়িয়া গেল। সে কহিল,—তাইতো তোমার কাছে এসেচি।

একটু পূর্ব্বে নিতাই বাণীর কমল-বনের স্বপ্ন দেখিতেছিল; শশীর কথায় সে স্বপ্ন ফাঁশিয়া গেল,—বাণীর কমল-বনে যেন বিদ্যুতের চমক বহিল! দুজনে বহুক্ষণ স্তব্ধ বসিয়া···

সে-স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সহসা নিতাই ডাকিল,—ওরে কাশি···

কাশিম সেই বাঁখারির কাঠিগুলা লইয়া অদূরে নাড়াচাড়া করিতেছিল, নিতাইয়ের আহ্বানে মুখ তুলিয়া তার পানে চাহিল। নিতাই কহিল—তুই সেই চরণ ভট্‌চায্যিকে জানিস্?

কাশিম বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল—না।

প্রদীপ্ত স্বরে নিতাই কহিল,—জানিস্ বৈ কি! সেই ফেরি-ঘাটে সেদিন তোকে মারতে উঠেছিল,—তুই গঙ্গায় নেমে জল ছুড়ছিলি···আর সেই নৌকো থেকে নামতে যার গায়ে সে-জল লাগে রে।

কাশিম উৎফুল্ল-কণ্ঠে কহিল—ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ···তিনি? তেনাকে চিনি বৈকি।

নিতাই কহিল,—তবেই আর-কি! আচ্ছা, তোকে একটা কাজ করতে হবে···

শশী কহিল,—মার-ধর করবে?

নিতাই কহিল,—যদি করি?

নিতাই গম্ভীর দৃষ্টিতে শশীর পানে চাহিয়া রহিল। শশী কহিল,—ওরা মজা পাবে। না, না, মার-ধর নয়! শেষে ফ্যাসাদ বাধে যদি···

নিতাই হাসিল, হাসিয়া কহিল—দাঙ্গা তাহলে চাও না ? বেশ,—দাঙ্গা-হাঙ্গামা করবো না। তবে শিক্ষা দিতে হবে—এমন শিক্ষা দেওয়া চাই যাতে বাছাধনরা বোঝে, দলে ভারী না হলেও ফন্দীফিকিরে ওস্তাদ আমরা !

শশী কহিল,—হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাই। সেই হলেই ভালো হয়। তবে এক ঢিলে যদি সব-কটাকে মারা যায়···

নিতাই কহিল,—তাহলে একটু ভাবতে দাও। আমি ঐ খাঁচাটা তৈরী করতে-করতে একটা উপায় চিন্তা করি। খাঁচা না হলে' কাশির ময়নাপাখী নিরাশ্রয় থাকবে কি না !

নিতাই উঠিল, উঠিয়া কহিল,—ওরে কাশি, আয়···তোর খাঁচাটা আগে বানিয়ে দি···

কাশিম মহা-উৎসাহে নিতাইয়ের হাতে বাঁখারিগুলা তুলিয়া দিল। নিতাই খাঁচা তৈয়ারীর কাজে মনঃসংযোগ করিল।

গাছের ডালে বসিয়া একটা ঘুঘু ডাকিতেছে—তার কেমন উদাস সুর ! সে সুরে শশীর মন এই সমাজপতিদের দৌরাত্ম্যের চিন্তা ছাড়িয়া ধীরে-ধীরে স্কুল-গৃহের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। সেই বাণীরূপিণী তরুণী ··বিশ্বের আলোয় শতদল ফুটাইয়া তাহারি পাপড়ির উপর পা রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছেন ! অপূর্ব্ব সে দৃশ্য !

নিতাই ডাকিল,—শশীদা···

শশী চমকিয়া নিতাইয়ের পানে চাহিল। নিতাই কহিল,—সেই বাগ্দীপাড়ায় যদি আমাদের ছাউনি ফেলি ?

শশী কহিল,—সে কথা তো সবাই জানে। ওতে আর প্রতিকারের উপায় কি হবে?

নিতাই কহিল,—ওরি মধ্যে একটু রকম-ফের করে' তোলা যায়…

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শশী কহিল—কি রকমটা হবে, বুঝতে পারচি না।

নিতাই কহিল,—একটা ফন্দী মাথায় এসেচে! এমন জাল পাতবো, ভাবচি, যাতে সে-জালে ওদের রুই-কাতলাগুলোকেও গাঁথতে পারি!…সতু বাঁড়ুয্যেও সেখানে যায় না, ভাবো?

শশী কহিল,—হয়তো যায়…কিন্তু আমি ঠিক বুঝচি না নিতাই, ওদিক দিয়ে কিছু করা যাবে কি না…

শশীর মুখের পানে নিতাই ক্ষণেক চাহিয়া রহিল, তারপর কহিল,—সে লোকটাকে চেনো? যে ছুঁচোটা বাড়ীতে সেঁধিয়েছিল?

শশী কহিল, না,—তার নাম-ধাম জানি না, তবে দেখলে চিনতে পারবো বৈকি। চোট লেগেচে, তার উপর গালে নাকি আব আছে।

নিতাই কহিল,—তবে চলো, এ-কাজটা সেরে একবার আমেরিকা-আবিষ্কারে বেরুই। সে লোকটার পাত্তা যদি মেলে, তাহলে আমাদের প্রতিকারের উপায়ও ঠিক হয়ে যাবে।

শশী কহিল,—বেশ। তুমি তাহলে কাজ সেরে নাও।

ক্ষিপ্র কৌশলে নিতাই তখনি খাঁচা গড়িয়া ফেলিল। খাঁচা

তৈয়ার হইলে কাশিমকে কহিল,—এই নে তোর খাঁচা। পাখীটাকে খাঁচায় রাখ্…কিন্তু শুধু রাখলেই চলবে না! খাওয়াবার কি ব্যবস্থা করলি?

কাশিম কহিল,—কেন? ছাতু! সক্কালেই আমি ছিরুর দোকান থেকে ছাতু কিনে এনেচি। খেতেও দিয়েচি!

নিতাই কহিল,—এক কাজ কর্…কলা দে—আর খুঁজেপেতে" ত্যালাকুচো আন্ দিকি…ওরা খেতে ভারী ভালোবাসে রে…বুঝলি?

খাঁচা হাতে তুলিয়া ঘাড় নাড়িয়া কাশিম কহিল,—ত্যালাকুচো …এখনি আনচি।

কাশিম চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে নিতাই কহিল—দাঁড়াও দাদা…আমি একটা জামা গায়ে দিয়ে নি। ভদ্র-পাড়ায় যাচ্ছি, ভদ্র-বেশে যাওয়া উচিত।…কি বলো?

হাসিয়া শশী কহিল,—নিশ্চয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

টগরের প্রতাপ

আলোর নীচেই অন্ধকার···এই সত্য প্রমাণ করিবার জন্যই যেন ফুলছড়িতে আর-একখানি নাটকের অভিনয় জমিবার সূচনা ঘটিল।

সদু বাঁড়ুয্যের কিশোর বয়স্ক পুত্র আনন্দ কলিকাতায় থাকিয়া আই-এ পড়িতেছে। একটু বেশী বয়সেই সে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে এবং পাশ করিয়া পড়ার নাম করিয়া সহরে থাকিবার ঝোঁকটা হইল বেশী। সদু বাঁড়ুয্যে ভাবিলেন, বংশে আনন্দ এই প্রথম একটা পাশ করিয়াছে···দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ জন্মিয়াছে। তাই একটির পর আর-একটি পাশের লোভ সদু বাঁড়ুয্যের মনকেও পাইয়া বসিল। কাজেই আনন্দর সহরে যাওয়ায় প্রতিবন্ধক ঘটিল না।

সদু বাঁড়ুয্যের বাড়ীর পাশেই বাঙলা স্কুল। পাড়ার মাতব্বরদের চাঁদায় এ স্কুলের সৃষ্টি হয় দশ বছর পূর্ব্বে। সদু বাঁড়ুয্যে সেক্রেটারি এবং যে-বাড়ীতে স্কুল, সে-বাড়ীর মালিকও সদু বাঁড়ুয্যে। স্কুলকে বাড়ী দিয়া মাসে-মাসে দশটা করিয়া টাকা ভাড়া লয় সদু। স্কুলের পিছন-দিকে থাকে স্কুলের মাষ্টার কেশব চক্রবর্ত্তী। কেশবের সংসারে আছে তার আটটি ছেলেমেয়ে আর তৃতীয় পক্ষের কিশোরী পত্নী টগর।

মনের মিল

টগর এই গ্রামেরই মেয়ে। শশীর বাড়ীর পাশে টগরের বাপ অবিনাশ রায়ের বাস। অবিনাশ কলিকাতার কোন্ অফিসে কেরাণীগিরি চাকরি করে···ফুলছড়ি হইতে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করিয়া চাকরি রাখা কঠিন এবং দুঃসাধ্য; তাই সে কলিকাতায় পাতিয়াছে আস্তানা। শনিবার-শনিবার বাড়ী আসে, আবার সোমবার ভোরের ট্রেনে বাহির হইয়া যায়। চাকরির উপর কলিকাতায় এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে তাঁর দুটি ছেলেকে পড়ায় এবং পড়ানোর বদলে বড়লোকটি অবিনাশকে তাঁর গৃহে থাকিতে এবং দুবেলা দুমুঠো খাইতে দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। অবিনাশ মাহিনা পায় চল্লিশ টাকা, ঘাড়ে চার-চারটি মেয়ে···টগর সবার বড়···ষোল বছর বয়সেও তাকে পাত্রস্থ করিতে পারে না! দুশ্চিন্তায় অবিনাশ কাতর···এমন সময় কেশবের সংসার শূন্য করিয়া তার দ্বিতীয়-পক্ষ লইল ইহলোক হইতে বিদায়। স্ত্রীর সঙ্গে বাস করা কেশবের এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, স্ত্রীবিহীন জীবন তার পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিল এবং সদু বাঁড়ুয্যের মধ্যস্থতায় অবিনাশের মেয়ে টগরকে সে তৃতীয় পক্ষে বরণ করিয়া জীবনকে আবার খাড়া করিল।

সদু বাঁড়ুয্যের বাড়ীতে টগরের যাতায়াত ছিল। সদু বাঁড়ুয্যের গৃহিণীর ফাই-ফরমাস খাটিত। তাঁর মাথার পাকা চুল তোলা, বড়ির ডাল বাটিয়া বড়ি দেওয়া, গা-হাত টেপা···এ-সব কাজে টগরের কখনো ত্রুটি ছিল না। এ-বাড়ীতে ভালো কিছু খাবার করিলে টগরকে তার অংশ দিতে

সদুবাবুর গৃহিণীর কখনো ভুল হইত না। এমনি সেবা-পরিচর্য্যায় এ-বাড়ীর সঙ্গে টগরের সংযোগ বেশ নিবিড় হইয়াই উঠিয়াছিল।

টগরের উপর আনন্দর প্রথম যখন দরদ মমতা জাগিল, তখন আনন্দর বয়স আঠারো বছর, টগরের বয়স বারো। স্বাস্থ্য ভালো—গড়ন ভালো···লেখাপড়ায় মন আছে—টগরের পানে ও-বয়সের ছেলে ফিরিয়া চাহিবে—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই! বিশেষ এ-বাড়ীতেই যখন টগরের অনেকখানি সময় কাটে···এবং···

আনন্দ নাটক-নভেল পড়ে। নাটক-নভেল পড়িয়া মনে-মনে সে বাসনা করে, সে যেন ঐ উপন্যাসের নায়ক আর টগর নায়িকা। টগরকে ডাকিয়া ছাদে উঠিয়া বলে—আমার ঘুড়ির ধরাই দিয়া যাও! মার কাছে টগর বসিয়া আছে, আনন্দ আসিয়া বলে,—টগর, আমার জামার দুটো বোতাম ছিঁড়ে গেছে, সেলাই করে' দেবে? মা বলেন টগরকে—যারে টগর, তোর আনন্দদার জামার বোতাম···

নিবিষ্ট মনে টগর বোতাম সেলাই করে আর আনন্দ তার পানে চাহিয়া থাকে বিমুগ্ধ বিহ্বল নেত্রে। নাটক-উপন্যাসের বাছাবাছা-পরিচ্ছেদগুলা মনে জাগে। অনেক ভাবে, ফশ্ করিয়া বলিবে কি—টগর তোমায় আমি ভালোবাসি।

কিন্তু বলিতে পারে না···সে কথায় টগর যদি ফোঁশ করিয়া ওঠে···যদি কাহাকেও বলিয়া দেয়!

অনেক সাধ জাগে, কিন্তু সে-সব শুধু কল্পনাতেই থাকে—অলীক কল্পনা লইয়াই আনন্দর দিন কাটে।

তারপর পাশ করিয়া কলিকাতায় আসিবে, হঠাৎ এমন সময় কেশব বিবাহ করিয়া বসিল টগরকে···বাপ সদু বাঁড়ুয্যে দাঁড়াইয়া থাকিয়া এ-বিবাহ দিলেন। আনন্দর বুকে যেন লক্ষ্মণের শক্তিশেল পড়িল!

বিবাহের দিন কতবার সে ভাবিয়াছে, টগরকে একান্তে ডাকিয়া বলিবে—ঠিক সেই উপন্যাসে যেমন লেখা থাকে, চলো, আমরা গায়ে ছাই মাখিয়া, হাতে কমণ্ডলু লইয়া সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী সাজিয়া হিমালয়ে যাই! কিন্তু এতটুকু ফাঁক পায় নাই। বিবাহ সে চোখে দেখে নাই, এবং লুচী-তরকারিও সেই উপন্যাসের নায়কের মতো স্পর্শ করে নাই।

তারপর সহর কলিকাতা। সেখানকার আবহাওয়া এবং সে আবহাওয়ায় অভিজ্ঞতা বাড়িলে সে ঠিক করিয়া লইল যে, বুড়া কেশবকে টগরের কখনোই মনে ধরে নাই—ধরিতে পারে না! তাই সে মনে-মনে কল্পনা করিত, একদিন সে যদি টগরকে···

কলিকাতায় থাকিবার সময় বসিয়া-বসিয়া আনন্দ ভাবে, এবারে দেশে গিয়া টগরকে মনের কথা বলিবে, কিন্তু দেশে আসিয়া টগরকে নিরালায় পায় না! কেশবের আটটা ছেলে-মেয়ে যেভাবে বাড়ীতে অষ্টবজ্রের বাঁধন আঁটিয়া আছে, সেখানে মাথা গলানো দায়!

মনের মিল

রাত্রি প্রায় আটটা। ছেলে-মেয়েদের লইয়া কেশব ওপারে তার দ্বিতীয়পক্ষের শ্বশুরবাড়ীতে গিয়াছে, কি নাকি পাকা দেখার নিমন্ত্রণ। বাড়ীতে টগর একা। রূপসী ষোড়শী স্ত্রীকে লইয়া হটর-হটর করিয়া ঘুরিতে কেশবের সাহস হয় না! ওপারে চটকলের সাহেব-সুবো আছে,—হাতখানা যদি ধরিয়া ফ্যালে? তার উপর পথে-ঘাটে খোট্টার আর কাবলীর যে-রকম আমদানী হইয়াছে···পাঁচটা ছেলে-ছোকরাও আছে··বাঁকা সিঁথি কাটিয়া চোরা-চোখে বেপরোয়া ভাবে টপ্পা গান গাহিয়া বেড়ায়···টগর একে এই গ্রামেরই মেয়ে—ছেলে-বয়স হইতে ঐ-সব ছেলে-ছোকরার মধ্যে কাহারও-কাহারও সঙ্গে হয়তো খেলা-ধূলাও করিয়াছে—এখন তাহার প্রদীপ্ত শিখার মতো রূপ···আর টগরের যে-রকম মিশুক স্বভাব···সকলকেই বিশ্বাস করে···তাকে যদি ছেলে-ছোকরারা ফুলঝুরি বা হাউই করিয়া···

কেশবের গৃহে উঠানে একরাশ জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। কোণে টগরের হাতে-পোঁতা বেলফুলের গাছে অজস্র ফুল··· সেগুলার পাশে হাস্‌নাহানার ঝাড়···দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া, হারিকেনের সামনে উপুড় হইয়া শুইয়া টগর নভেল পড়িতেছে—বঙ্কিমের চন্দ্রশেখর। এ-বই আনিয়াছে দীনু মুখুয্যের বউএর কাছ হইতে···বউ সহরের মেয়ে···বাংলা নাটক-নভেল কেনে। টগর তার কাছ হইতে বই আনে, আনিয়া পড়ে, পড়িয়া ফেরত দেয়, ফেরত দিয়া আবার নূতন বই আনে।

টগর পড়িতেছিল সেইখানটা—সেই ভীমা পুষ্করিণী হইতে ফিরিয়া শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের কথামতো তাঁর অন্নব্যঞ্জন সাজাইয়া ঢাকা দিয়া রাখিয়া ঘরে গিয়া শুইয়াছে···আর চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর রূপরাশি দেখিয়া ভাবিতেছেন,. শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে এ-রত্ন তিনি কেন আনিলেন ?

পড়িতে-পড়িতে টগরের বুকের মধ্যে কেমন হু-হু করিয়া উঠিল ! বইয়ের পাতা হইতে মুখ তুলিয়া টগর চাহিল আকাশের পানে। জ্যোৎস্নায় ফিনিক্ ফুটিয়াছে—দূরে কোন গাছে একটা পাখী ডাকিতেছে। বুকে একরাশ নিশ্বাস···মনে হইল, নভেলের এ শৈবলিনী যেন টগরই ! টগর একদিন কত স্বপ্ন দেখিত···হাসি গান আলোর স্বপ্ন ! ভাবিত, বিবাহ হইলে স্বামীর আদরে সোহাগে···

বিবাহ হইয়াছে। স্বামীর যে-ছবি মনে আঁকিত, তার সঙ্গে কেশবের কোথাও মেলে না ! ভালোবাসার কি জানে কেশব ? কেশবের গৃহে রান্নাবান্না—তার ঐ আটটা ছেলে-মেয়ের তদ্বি সহা—ছেলেমেয়েরা তাকে মানেও না···বড়-মেজ তাকে টগর বলিয়া ডাকে, কথায়-কথায় তাকে শাসায়, চোখ রাঙায় ! কি করিয়া যে টগরের দিন কাটে ! সখ হয়, পরিপাটি করিয়া চুল বাঁধে, কপালে ছোট খয়েরের টিপ আঁকে, রং-করা শাড়ী পরে—কিন্তু মিথ্যা ! সে সাজ কেশব কোনদিন চোখ তুলিয়া দেখিবে না ! লোকে বলে, টগর রূপসী। কিন্তু, কেশব ? তার সম্পর্ক টগরের দেহখানা লইয়া···

টগরের যে মন আছে, সে মনের খোঁজ কেশব কোনোদিন লইল না।

হঠাৎ নিঃশব্দে কে আসিয়া চাপা-গলায় ডাকিল,—টগর···

চমকাইয়া ধড়মড় করিয়া টগর উঠিয়া বসিল—চাহিয়া দ্যাখে, আনন্দ। কহিল,—তুমি হঠাৎ ?

আনন্দ বলিল,—হ্যাঁ। কলেজের ছুটি হলো। আমি এই সন্ধ্যার একটু আগে বাড়ী এসেছি।

টগর শুধু বলিল, ও।

আনন্দ বলিল,—তোমার ছেলে-মেয়েদের দেখছি না যে ?

—না। তারা নেমন্তন্ন গেছে ওপারে—সিধুর মামার বাড়ীতে—পাকা দেখা।

—কেশবঠাকুর ?

—সঙ্গে গেছে।

আনন্দর মনে হইল, তার পৃথিবীতে আজ বসন্তোদয়! হৃদয়কে মেলিয়া ধরিবার চমৎকার সুযোগ। কিন্তু কি বলিয়া সুরু করে ?

টগরের পানে চাহিল। টগরের সারা গায়ে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে···কি অপরূপ তার শ্রী ফুটিয়াছে!···টগর চাহিয়া আছে আকাশের পানে···উদাস দৃষ্টি!

বইখানার উপর নজর পড়িল, টানিয়া দেখিল, চন্দ্রশেখর। বুকে এক-ঝলক বসন্তের বাতাস···আনন্দ কহিল,—চন্দ্রশেখর পড়ছো ?

টগর বলিল,—হুঁ…

তার কণ্ঠ স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো।

বইয়ের যে-পাতা পড়িতেছিল, তার কোণটা ছিল মোড়া—সে-পাতার কটা লাইনে আনন্দ চোখ বুলাইয়া লইল। ছু'একখানা পাতাও উল্টাইল…ফষ্টরের লাইনটা চোখে পড়িল, নাউ অর নেভার! আনন্দ ভাবিল, ফষ্টর যেন তাকেই ইঙ্গিত করিতেছে!

কি বলিতে যাইতেছিল—বাষ্পোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ রুদ্ধ…কাসিয়া গলা সাফ করিয়া আনন্দ ডাকিল,—টগর…

টগর তার পানে চাহিল, বলিল,—কি?

—নভেল যে পড়ো, এর সব কথা বুঝতে পারো?

টগর অবাক! প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিল না। প্রশ্ন করিল,—তার মানে?

—না…মানে, জিজ্ঞাসা করছি, অনেকে নভেল পড়ে, শুধু ঐ গল্পই বোঝে, কিন্তু নভেলে যেসব লোকের কথা থাকে, তাদের ছুঃখ কোথায়, সুখ কিসে, কি তারা চায়, বোঝেনা…

আনন্দর কথাগুলা খুব স্পষ্ট নয়…কেমন বাধিয়া-বাধিয়া যাইতেছে। টগর কোনো জবাব দিল না।

আনন্দ বুঝিল, তার কথার মর্ম্ম টগর উপলব্ধি করে নাই! তাই সে কাসিয়া আবার গলা সাফ করিল। গলা সাফ করিয়া আনন্দ বলিল, চন্দ্রশেখর পড়ে' আমার কিন্তু তোমার কথা মনে হয়।

টগর আশ্চর্য্য হইয়া আনন্দর পানে চাহিল।

আনন্দ বলিল,—আমার মনে হয় তুমি যেন শৈবলিনী…আর কেশবঠাকুর তোমার চন্দ্রশেখর…নয়? শৈবলিনী সুন্দরী, শৈবলিনীর বয়স কম…তোমার সঙ্গে মেলে। আর, চন্দ্রশেখরও কেশবঠাকুরের মতো বুড়ো মানুষ। চন্দ্রশেখর পুঁথি পড়ে, কেশব-ঠাকুর ছেলে পড়ায়।

টগরের ভারি মজা লাগিল। হো-হো করিয়া হাসিয়া টগর বলিল,—আর, আমার প্রতাপ?

আনন্দর মাথায় খানিকটা ঘুর্ণি-হাওয়া…তার মাথা ঘুরিয়া গেল! কোনোমতে আনন্দ বলিল,—নেই কি?

—কোথায়? এঁ্যা? হাসিয়া টগর যেন লুটাইয়া পড়িবে!

আনন্দর বুকে কে যেন হাতুড়ি পিটিতেছে! কিন্তু…

আনন্দ ভাবিল, না, একটু সাহস…বাড়ীতে কেহ নাই…টগর একা…বাছিয়া-বাছিয়া যখন চন্দ্রশেখর পড়িতেছে এবং হাসিয়া কথা কহিতেছে…আনন্দ বলিল, যদি বলি, আমি তোমার প্রতাপ?

—তুমি! টগর এবার হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল…অনেক-ক্ষণ হাসিল, তারপর বলিল,—কি করে'? কবে আমি তোমার সঙ্গে নদীর ঘাটে বসে' নৌকো গুণেছি? আকাশের তারা গুণেছি? জলে সাঁতার কেটেছি?—এঁ্যা?

এ-কথার সহজ সারল্যে আনন্দ বিহ্বল, বিভোর…বলিল, নৌকো গোণা, তারা গোণা—ও-সব নভেলেই চলে। আসলে,

মনের মিল

এই দ্যাখো, কলকাতায় বসে'-বসে' কেবল তোমার কথাই, আর সেইসব কথা নিয়ে তোমার নামে কত পদ্য লিখেছি।

বলিয়া পকেট হইতে ঝক্‌ঝকে বাঁধানো একখানি ছোট খাতা বাহির করিয়া টগরের হাতে দিল।

খাতাখানা দেখিয়া টগর বলিল,—এই এত পদ্য···এসব তুমি লিখেচো ? য়্যাঁঃ !

চোখে বিজয়ী-বীরের দৃষ্টি···আনন্দ বলিল,—হ্যাঁ। আর এ-সব পদ্য তোমার নামে লেখা !

টগর বলিল—কলকাতায় তাহলে' তুমি লেখাপড়া করোনা, শুধু আমার নামে পদ্যই লেখো ?

আনন্দ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—তুমি কি বুঝবে, তোমার জন্য আমার···

কথাটা শেষ হইল না।

টগর অবাক ! আনন্দর পানে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া টগর বলিল,—পড়বো এ পদ্য ?

—পড়বে কি। তোমাকে পড়াবার জন্যই তো আমার লেখা···এ আমার মনের কথা···এই ত্যাখো, এ-খাতার নাম দিয়েছি···

খাতার প্রথম পাতা আনন্দ দেখাইল। বড়-বড় অক্ষরে লেখা 'মনের কথা'···তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমি পড়ি, তুমি শোনো।

খাতার একখানা পাতা খুলিয়া আনন্দ সুরু করিল :

তোমার কথাই ভাবছি আমি রাত্রি-দিবা
আমার আঁধার-মনে তুমি উজ্বল বিভা !
আমি হেথায় মগ্ন আছি তোমার ধ্যানে—
তুমি যাকে নিয়ে আছো—সে কি তোমার মূল্য জানে ?

পাতা উল্টাইয়া আর-একটা কবিতা পড়িল :

তোমার আসন আমার হৃদয়-মন্দিরে,
এমন আসন তোমারে কে দিতে পারে ?
আপন বলিয়া পাশে পাইয়াছ যারে—
সে মূঢ় বৃদ্ধ হৃদয় ফেলিবে চিরে।

টগর অবাক! কি এ-সব···পাগলের প্রলাপ যেন···

হঠাৎ বাহিরে ও-বাড়ীর বিন্দুর গলা! বাহির হইতে বিন্দু ডাকিল, টগর আছিস্ ?

আনন্দ কাঁপিয়া উঠিল···ঝাঁ করিয়া খাতাখানা পকেটে পুরিয়া আনন্দ এক-লাফে সামনের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

বিন্দু উঠানে আসিল···

টগর বলিল,—বৌদি ? তুমি হঠাৎ ?

—হ্যাঁ। বাড়ীতে সত্যনারাণ ছিল, তাই শিনি এনেছি ···তুই ভালোবাসিস···একটা পাত্র আন্।

টগর পাত্র আনিল···আসিয়া শিনি বাতাসা সন্দেশ লইল।

মাদুরের সামনে একজোড়া জুতা···বিন্দু দেখিল, বলিল, কার জুতো রে ?

—আন্দদার।

—সতুবাবুর ছেলে আনন্দ ?

—হুঁ। এসেছে। ঐ ঘরে কি একখানা বই খুঁজছে।

ঘরে বসিয়া আনন্দ তারিফ করিল টগরের বুদ্ধির।

টগর হাঁকিল,—বই পেলে আন্দদা ?

ভিতর হইতে আনন্দ জবাব দিল,—না।

হাসিয়া টগর বলিল,—অন্ধকারে কোথায় হাতড়াবে ? হারিকেনটা দেবো ?

ভিতর হইতে আনন্দ বলিল,—দাও।

বিন্দু বলিল, এরা কোথায় গেছে—ছেলেরা ?

টগর বলিল,—নেমন্তন্ন গেছে, ওপারে।

—ও! বলিয়া বিন্দু চলিয়া গেল।

বিন্দু বাহির হইয়া গেলে টগর বলিল, আনন্দকে উদ্দেশ করিয়া,—বেরিয়ে এসো, চোরের মতো আর অন্ধকার-কোণে থাকতে হবে না।

আনন্দ আসিল বাহিরের দাওয়ায়। টগর বলিল, বাড়ী যাও। এ-রকম করে' আর এসো না। আমি আর-একজনের বউ—লোকে দেখলে নিন্দা করবে।

—কিন্তু···আনন্দ মরিয়া হইয়া উঠিল, বলিল,—আমি তোমায় ভালোবাসি টগর···নতুন ভালোবাসা নয়—অনেক দিন থেকে।

হাসিয়া টগর বলিল,—সত্যি ? কিরকম ভালোবাসো

আন্দদা—এই সব নভেলে যেমন লেখা থাকে? •••কথার শেষে টগর আবার হাসিল।

আনন্দ হতভম্ব। বলিল,—হাসলে যে?

—তুমি হাসাচ্ছো আর আমি হাসবো না? বাড়ী যাও আন্দদা। ভালো যদি বেসে থাকো, উপায় তো নেই!

আনন্দ ফোঁশ করিয়া উঠিল। —কেন নেই উপায়!

—আমি আর-একজনের স্ত্রী।

—তাতে কি?

—মাথা খারাপ করো না। যাও, বাড়ী যাও। যে-কথা বললে, আর বলো না···বলতে নেই।

—না,···না···না···তোমাকে আমি বুঝিয়ে দেবো টগর···

—কিন্তু এ-সব বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার নেই আন্দদা। ··সত্যি, কি বিপদে আজ ফেলেছিলে আমায় বলো তো? বিন্দু-বৌ এসে দেখে গেল···কিছু মনে করে যদি...

—কি মনে করবে! হুঁঃ! ওঁর কথা শোনো নি?··· ওই উজবুক চরণ ভট্চায্যি···তার ওপরে ওঁর···

—ছি ছি ছি, এ-সব কথা মুখে উচ্চারণ করো না, মুখে ঘা হবে। তার চেয়ে বলো যদি, আমি গিয়ে জ্যাঠাইমাকে বলবো তোমার বিয়ে দিতে।

জ্যাঠাইমা অর্থে আনন্দর মা! সদু বাঁড়ুয্যের গৃহিণী!

নিশ্বাস ফেলিয়া আনন্দ বলিল, বিয়ে আমি করছি কি না!

টগর বলিল, বিয়ে না করো, বেশ, করো না। তাবলে

আর-একজনের বৌকে ভালোবাসা জানাতে এসো না। আমি বারণ করছি। আমি তোমার এ-কথা শুনবো না। তুমি বাড়ী যাও।

টগরের কণ্ঠ তীক্ষ্ণ এবং কথাগুলা বেশ স্পষ্ট। এ-কথার পর···

বেত-খাওয়া কুকুরের মতো আনন্দ চলিয়া গেল।

———

নবম পরিচ্ছেদ

সুমিত্রার স্বপ্ন

স্কুলের বারান্দায় বসিয়া সুমিত্রা একখানা চিঠি পড়িতেছিল। চিঠি ইংরাজীতে, টাইপ করা···মিশন্-হোম হইতে আসিয়াছে।

সেক্রেটারী লিখিয়াছেন,—ফুলছড়ির স্কুলে বোর্ডিংয়ের জন্য পাকা ঘর তৈয়ারীর প্রস্তাব সোসাইটি মঞ্জুর করিয়াছে; এবং মিশন্-হোম তার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য এক হাজার টাকা শীঘ্র পাঠাইবে। তাছাড়া, চাঁদার যে-প্রতিশ্রুতি মিলিয়াছে, হিসাবে দেখা যাইতেছে, তাহাতেও প্রায় সাত-আটশো টাকা সংগ্রহ হইবে। এ টাকাগুলা সুমিত্রার কাছে পাঠানো হইতেছে। কাজ সুরু করিয়া দেওয়া হোক্···কনট্রাক্টার শীঘ্র আসিবে। এবং সুমিত্রাকেই সকল ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে।

সুমিত্রা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। ছেলেমেয়েদের সংখ্যা যে-ভাবে বাড়িতেছে, তাহাতে এ-ঘরে কুলানো পরে সম্ভব হইবে না। তাছাড়া পাতার ঘর—বেশী জোরে জল-ঝড় হইলে ঘর রক্ষা করা দায়! এবং মেয়েদের আর ছেলেদের জন্য আলাদা ঘর চাই। মঞ্জুর কয়েক মাস ধরিয়া লেখালেখির ফলে মিশন্-হোম তার প্রস্তাব যে করিয়াছে, ইহাতে সুমিত্রার আনন্দের সীমা নাই।

একটা বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল, তুয়ারা গ্রামের যে-ছেলেটি

জ্বর-গায়ে বাড়ী গিয়াছিল, তার সে-জ্বর খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। তার বাপ, না খুড়া, কে আসিয়াছে দেখা করিতে। ছেলেটির চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিলে নয়।

সুমিত্রা তখনি উঠিল। স্কুলের প্রান্তসীমায় ক্যাম্বেলের-পাশ ডাক্তার সুহাস দত্তর আস্তানা। সুমিত্রা তার কাছে ছুটিল। ডাক্তার তখন ছোট্ট ডিস্‌পেন্‌সারিতে দাঁড়াইয়া একটা শিশি ধুইতেছেন।' সুমিত্রা কহিল,—আপনাকে এখনি একবার যেতে হবে আমার সঙ্গে···ছুয়ারায়। স্কুলের একটি ছেলের খুব জ্বর···

সুহাস ডাক্তার কহিলেন—আমি দশ মিনিটে তৈরী হচ্ছি। তাদের ওখান থেকে লোক এসেচে ?

সুমিত্রা কহিল—এসেচে। আমিও সঙ্গে যাবো।

—আপনি !

ডাক্তার সবিস্ময়ে সুমিত্রার পানে চাহিলেন।

সুমিত্রা কহিল,—বেড়াতে-বেড়াতে যাবো'খন।

সুমিত্রা আসিয়া লোকটির সঙ্গে দেখা করিল, তাকে আশ্বাস দিয়া সংবাদ লইল, ছুয়ারা কত দূরে !

লোকটি কহিল,—ফুলছড়ির পরেই ছুয়ারা।

সুমিত্রা নিজেকে সজ্জিত করিয়া লইল। তারপর ডাক্তার আসিলেন বাইসিক্ল লইয়া। বাইসিক্লে আর চড়া হইল না। তিন-জনে ছুয়ারার দিকে চলিল। ফুলছড়ির বাগ্দী-পাড়া ছাড়াইয়া ছুয়ারা। মাঠের প্রান্তে কয়েকখানা পাতার কুঁড়ে—দারিদ্র্যের জীর্ণতা রী-রী করিতেছে। নোংরা পল্লী।

সুমিত্রা কহিল,—এ নোংরায় অসুখ করবে না ?

সুহাস ডাক্তার কহিলেন,—এরা বেঁচে থাকে কি করে' সেইটেই ভাববার কথা !

সুমিত্রা বলিল,—এসব দেখে বুক কেঁপে ওঠে—কি করে' বাঙালী জাত আমরা আত্মঘাতী হচ্ছি। জমিদার আছেন কি করতে ?

সুহাস ডাক্তার কহিল,—গ্রামের জমিদার শুধু খাজনা আদায় করে। এরা কিসে ভালো থাকবে, সেদিকে এতটুকু লক্ষ্য নেই।

সুমিত্রা বলিল,—কিন্তু, এদের কাছ থেকে টাকা আদায় করবেন, এদের ভালো-মন্দ দেখবেন না ? জমিদার মানে তো, রাজা !

সুহাস হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন—তার কি দায় পড়েচে অত দেখতে ! তার সম্পর্ক ঐ টাকার সঙ্গে···

সুমিত্রা কহিল—আমাদের স্কুল এ-জায়গায় খুলে বড় ভালো কাজই করা হয়েচে ! ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হলে' যদি তাদের দুর্গতি ঘোচে···

রোগীর গৃহও তেমনি···যেন ছোট একটা গহ্বর। আলো-বাতাসের নাম নাই। ঘরে কে আছে, তাও লক্ষ্য হয় না।

আলো চাওয়া হইল—একটা কেরোসিনের ডিবা আসিল।

দেখিয়া সুমিত্রা শিহরিয়া উঠিল ; কহিল—নিয়ে যাও, নিয়ে যাও ও আলো। কেরোসিনের ধোঁয়ায় রোগীর বিপদ ঘটবে।

রোগী দেখা হইল—কেশ্ নিউমোনিয়া। তবে খুব সাংঘাতিক হয় নাই। কিন্তু এ-রোগের পরিচর্য্যা এখানে কি করিয়া হয়?

সুমিত্রা বুঝাইয়া বলিল, স্কুলে ছেলেটিকে লইয়া চলো—সেখানে হাসপাতাল আছে। ছেলের মা-বাপ সঙ্গে থাকিবে, চিকিৎসার সুবিধা হইবে!

বহু আলোচনায় তাদের রাজী করা গেল। সুমিত্রার মূর্ত্তি, সুমিত্রার মুখের কথা··তারা গলিয়া গেল। তাছাড়া তারা তো পরিচয় পাইয়াছে—গরীব-দুঃখী বলিয়া কেহ সংবাদ লয় না; আর ইনি কত সাধিয়া ছেলের লেখা-পড়ার ভার লইয়াছেন! এমন দরদ-ভরা কথা···গরীব-দুঃখী ইহাতে আর ভুলিবে না? এমন কথা তারা কোনো পুরুষে কখনো শোনে নাই! পরের কাছ হইতে পায় শুধু আদেশের হুম্‌কি, তাড়া আর লাঞ্ছনা, তিরস্কারের তীব্র হুঙ্কার!

সুমিত্রা কহিল,—ডুলি পাওয়া যাবে?

ছেলেটির বাপ কহিল—আমি কোলে করে' নিয়ে যাবো।

সুমিত্রা কহিল—বেশ, ঢাকা দিয়ে নিয়ে চলো। ডাক্তার বাবু বাইসিক্লে যাচ্ছেন, আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো···

কথাবার্ত্তা পাকা হইলে আয়োজনে বিলম্ব ঘটিল না। ছেলেটিকে বুকে তুলিয়া তার বাপ সলীম তখনি পথে বাহির হইল। সুমিত্রা এবং ডাক্তার সঙ্গে চলিল।

সুমিত্রা কহিল—আপনি আবার হাঁটবেন কেন ডাক্তারবাবু? আপনি বাইসিক্লে চড়ে এগিয়ে যান্।

সুহাস কহিলেন—একসঙ্গে যাচ্ছি, মন্দ কি!

সুমিত্রা কহিল—আপনি আগেই যান্। এর বিছানার ব্যবস্থা করিয়ে ফেলুন। আমরা আস্তে-আস্তে যাচ্ছি···

সুহাস রাজী হইলেন না। সুমিত্রার অনুরোধের অন্ত নাই! অগত্যা সুহাসকে বাইসিক্লে চড়িয়া অগ্রসর হইতে হইল।

সুমিত্রা তখন সলীমের সঙ্গে তার ঘরকর্ণার কথা পাড়িল। বেচারী সলীম! একটু ক্ষেত-খামার আছে। সংসারে নিজে আর বড় ছেলে—দু'জনে ক্ষেতে কাজ করে। কতকগুলা গরু আছে, হাঁস আছে। গরুর দুধ গ্রামের কেহ লয় না—জাতে সে মুসলমান···তাই। ভিন্ন গ্রামের এক গোয়ালার কাছে গিয়া প্রত্যহ দুধ বেচিয়া আসে। গরজ সলীমের, কাজেই দামে তার পোষায় না! হাঁসে ডিম দেয়—ডিম বেচিয়া দু' পয়সা আসে,—তবে, জুলুমও আছে। ফুলছড়ির বাবুরা যা-খুশী দাম দেয়। জমিদার বাঁড়ুয্যের মেজাজ ভারী কড়া। খাজনার পয়সা ঠিক দিনে দেওয়া চাই। না দিলে অকথা, কুকথার অন্ত থাকে না···কথার উপর তার লোকের হাতে কাণ-মলা প্রভৃতি ঘটিয়া যায়! গরু-বাছুর অবধি টানিয়া লইয়া যাইতে ত্রুটি রাখে না!

সুমিত্রা কহিল—গরু-বাছুর নিয়ে যায়? আদালতের হুকুমে?

সলীম্ কহিল—না। ওঁরাই আদালত, মা···

সুমিত্রা কহিল—বটে! কিন্তু তা তো নিয়ে যেতে পারে না! আইন নয়!

নিশ্বাস ফেলিয়া সলীম্ কহিল—ওঁরাই আইন, ওরাই আদালত। গরীবের আর আইন-আদালত কোথায়?

সুমিত্রা কহিল—হুঁ।

এমনি কথায়-কথায় সকলে যখন স্কুল-গৃহে আসিয়া পৌঁছিল, বেলা তখন সাড়ে-ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। সুহাস ডাক্তার ব্যবস্থাদি করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং কোনো বিশৃঙ্খলা ঘটিল না।

সলীমের ছেলের ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া সলীমের স্থান-নির্দ্দেশান্তে সুমিত্রা স্কুলে ফিরিয়া দ্যাখে, বিজলী আসিয়া বসিয়া আছে। সুমিত্রাকে দেখিয়া হাসিয়া বিজলী কহিল—Good morning Miss Florence Nightingale...

সুমিত্রা কহিল,—তাঁর পায়ের ধূলো হবার যোগ্যতা যেন অর্জ্জন করতে পারি, সেই প্রার্থনা করো বিজলী···

বিজলী কোনো কথা কহিল না···স্থির দৃষ্টিতে সুমিত্রার পানে চাহিয়া রহিল।

সুমিত্রা কহিল—কি খপর? চাকরি হলো?

হাসি-মুখে বিজলী কহিল—নিশ্চয়।

সুমিত্রা কহিল—ভালো।···তা, চাকরিতে না গিয়ে এখানে এ-সময়?

বিজলী কহিল—একটু কাজ ছিল…

সুমিত্রা কহিল—কি ?

বিজলী কহিল—যে পুণ্য-ব্রতই তুমি নাও সুমিত্রা, একটা কথা শুধু মনে রেখো…

সুমিত্রা কহিল—কি কথা ? বলো…

বিজলী কহিল,—আমার ভবিষ্যৎ-রচনার এই যে আয়োজন, এ-আয়োজনটুকু তোমারি সম্বর্দ্ধনার জন্য…

কথার অর্থ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া সুমিত্রা বিজলীর পানে চাহিল। বিজলী তার সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিল। সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—মানে, ছেলেবেলায় দু'দিক থেকে এসে দু'জনে একসঙ্গে মিশেচি। আমাদের হাসি-গল্প একসঙ্গে…অনেক স্বপ্ন গড়েচি, তাও একসঙ্গে…আমাদের জীবনটুকু এমনি একসঙ্গে মিশে বয়ে যেন চলে চিরদিন… এই আশ্বাসটুকু যদি পাই…

সুমিত্রা দিগন্তের পানে চাহিয়া রহিল। তার দৃষ্টি উদাস। সে যেন কালের যবনিকার অন্তরালে 'বহু দূর ভবিষ্যৎ দেখিবার চেষ্টা করিতেছে !

বিজলী সুমিত্রার কাছে অগ্রসর হইয়া আসিল—সুমিত্রার একখানা হাত নিজের হাতে লইয়া ডাকিল—সুমিত্রা…

সুমিত্রা কেমন চমকাইয়া উঠিল…ধীরে-ধীরে হাত মুক্ত করিয়া লইল।

বিজলী কহিল—বলো…

সুমিত্রা কহিল—এ-সব কথা কখনো ভেবে দেখিনি বিজলী···কি বলবো?

বিজলী কহিল—কিছু নেই বলবার? ফাদার তো এমন আভাসও···

সুমিত্রা কহিল—আমার নিজের ভবিষ্যতের কথা কখনো ভাবিনি তেমন করে'···

বিজলী কহিল—যাই ভাবো, নিজেকে একেবারে ভাসিয়ে দিয়ো না।···তোমার নিজের জীবনের দাম অল্প নয়। এ-পৃথিবীতে ও-জীবনের দাম বোঝে, এমন লোকও আছে···জেনো।

সুমিত্রা কহিল—বলবো, দেখবো ভেবে···

বিজলী কহিল—হ্যাঁ, দেখো।

দশম পরিচ্ছেদ

তারিণী

সে লোকটির পাত্তা পাইতে বিলম্ব ঘটিল না। তার নাম—তারিণী। চরণের দূর-সম্পর্কের সম্বন্ধী। আর কোথাও আস্তানা না পাইয়া চরণের স্ত্রীর কাছে আসিয়া জুটিয়াছে—চরণের লাথি-জুতা হাসিয়া অম্লান বদনে সহিতে চায়! নিরুপায় দেখিয়া চরণ অগত্যা চুপ করিয়া গিয়াছে। পত্নী তার পক্ষ লইয়াছে—কাজেই চুপ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

এখন এই লোকটাকেই চরণ ধরিয়াছে—তার বদমায়েসীর অভিসন্ধিতে ঘুরাইবার জন্য। কথায় বলে, যাকে রাখো, সেই রাখে···এ-কথা কতখানি খাঁটি, চরণ আজ তা হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়াছে।

তারিণীও যোগ্য সাকরেদ। চরণ এক-পা আগাইতে বলিলে, সে আগাইয়া যায় চার পা। সুতরাং তার পশার হইল—শুধু চরণের কাছে নয়, চরণের অভিভাবক শ্রীযুক্ত সদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও।

নিতাই আর শশী বাগ্‌দীপাড়ায় ঘুরিতেছিল···সেই পাড়ার এক কুটীর হইতে অকস্মাৎ তারিণী বাহির হইল। তাকে দেখিয়া শশী কহিল—এই লোক···

নিতাই কহিল—ঠিক বলচো ?

শশী কহিল—উঁহু, ভুল হতে পারে না। ঐ যে গালে আব।

ব্যস্। নিতাই অমনি গিয়া খপ্ করিয়া তার হাত ধরিল, কহিল—দাঁড়া…

তারিণী ভড়কাইয়া গেল। হঠাৎ এমন…

মুখখানা কাঁচুমাচু করিয়া তারিণী কহিল—ছুটো তরকারির চেষ্টায় এসেছিলুম…

তরকারি! তাহা হইলে ইহার মধ্যে অনেকখানি গূঢ় রহস্য আছে!

নিতাই কহিল—হাত তো খালি দেখচি! তরকারি কৈ?

সপ্রতিভ ভঙ্গীতে তারিণী কহিল—ওবেলায় নিয়ে যাবো তাই বলতে এসেছিলুম…

—কার কাছে বলতে এসেছিলে? চলো, মোকাবেলা ক'রে দাও।

নিতাইয়ের স্বর কড়া—তাহাতে আদেশের সুর! তারিণী আবার ভড়কাইল।… করুণ দৃষ্টিতে সে নিতাইয়ের পানে চাহিল। নিতাই ছাড়িবার লোক নয়…বিশেষ ইহার অন্তরালে রহস্যের আভাস পাওয়া গিয়াছে যখন…

তারিণীর পা আর চলিতে চায় না…অথচ চলিতে হইবে! নিতাই ক্রমাগত ধাক্কা দিতেছে…নিতাইয়ের গায়ে বেশ জোর। আর এই নিমেষের দর্শনে ঘর্ষণে তারিণী বেশ বুঝিয়াছে, নিতাই লোকটি মোটেই ভালো মানুষ নয়!

যে-দ্বার মাড়াইয়া এইমাত্র আসিয়াছে, সেই দ্বারে গিয়া আবার দাঁড়াইতে হইল। নিতাই কহিল—কে তোমার লোক, বলো ?

তারিণীর চোখে আবার সেই করুণ দৃষ্টি ! নিতাই তাহাতে ভুলিবার পাত্র নয় ! তার মনে একটা কথা···

তারিণী কহিল—আছে, মেয়ে-লোক।

নিতাই হুঙ্কার দিল, কহিল—মেয়ে-লোকই হোক আর যে-লোকই হোক, ডাকো। আমি মোকাবেলা করতে চাই। তোমার রকম দেখে মনে হচ্ছে, তোমার মতলব ভালো নয়।

এ-কথায় তারিণী একেবারে অবাক হইয়া গেল ! নিতাই তাকে ধাক্কা দিয়া কহিল—ডাকো···

তার চীৎকার গৃহমধ্যেও বিস্ময় জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এক প্রৌঢ়া রমণী আসিয়া দ্বার-প্রান্তে উঁকি দিল, কহিল—কি হয়েচে গা ?

নিতাই কহিল—এ লোকটি এখানে তোমাদের বাড়ী কেন এসেছিল ? দেখচি, জাতে বামুন···

রমণী কহিল—ও এসেছিল, ওর খুশী। তার জবাবদিহি দেবো কিসের জন্য বলো তো, ঠাকুর ?

নিতাই পাড়ার ছেলে···সকলেই তাকে চেনে। নিতাই কহিল,—আমি জবাবদিহি চাই···নাহলে এখনি একে টেনে সতুবাবুর কাছে নিয়ে যাবো।

রমণী কহিল—আমাদের ভট্‌চায্যিমশাইয়ের একটু কাজ ছিল···তাই খাজনার তাগাদায় এ-পাড়ায় এসেছিল।

—বটে! তারিণীর পানে চাহিয়া নিতাই কহিল—কি গো, এ কি বলে?

তারিণী নিরুত্তরে নিরুপায় দৃষ্টিতে নিতাইয়ের পানে চাহিল।

নিতাই সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া রমণীকে কহিল—কত খাজনা দিয়েছো?

রমণী কহিল,—আজ দিইনি! আর-একদিন আসতে বলেচি।

নিতাই কহিল—হুঁ, চেক্-মুড়ি কৈ? বলিয়া তারিণীর পানে চাহিল।

রমণী কহিল—সকালবেলা কি ঝামেলা করচো ঠাকুর আমার দোরে? আর কোনো কাজ নেই তোমার?

নিতাই দেখিল, রমণীর রসনা বেশ খর-ধার। স্ত্রীলোকের সঙ্গে কি তর্ক করিবে! তারিণীকে ধরিয়া সে হ্যাঁচ্‌কা দিল, দিয়া কহিল—চলো, তোমাকে ছাড়চি না। একেবারে সজু-বাবুর কাছে নিয়ে যাবো। চেক-মুড়ি নেই, কিছু না,—এদের কাছে খাজনা চাইতে আসো, এ-কথা তাঁকে জানানো দরকার।

তারিণী প্রমাদ গণিল। সে এখানে আসে অতিনিঃশব্দে এবং গোপনে। তারিণীর এখাসে আসা চরণ পছন্দ করে না···নিষেধ করিয়াছে, বলিয়াছে—ওরা ছোটলোক···ও-পাড়ায় যাস্ নে, এক-ঘরে হতে হবে!···কিন্তু সে-কথার পরেও··· চরণের যাতায়াতে কৌতূহলী হইয়া তারিণী আসিতেছিল।

আসিয়া ঐ ক্ষেত্রমণি ওরফে ক্ষেতুর যত্নসেবা, তার সাজা তামাকের প্রসাদ···সে যেন রাজার আদর! তাছাড়া চরণের বয়স হইয়াছে···তারিণীর জোয়ান বয়স···দায়ে পড়িয়া চরণের সেবা করিলেও ক্ষেতু চায় তারিণীকে···ক্ষেতুর অনুগ্রহ পাইয়া তারিণী বর্ত্তাইয়া গিয়াছে···চরণের বাড়ীতে পড়িয়া থাকে ন্যাংলা কুকুরের মতো···এখানে সে ক্ষেতুর হৃদয়বিহারী···ক্ষেতু তাকে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে, কোনো ভয় নেই, তুমি এসো ঠাকুর। আমি তোমারি। এখন এ গোপন-লীলার কথা প্রকাশ হইয়া গেলে···চরণের গৃহে কি ঠাঁই থাকিত?

তারিণীকে টানিয়া নিতাই পথে বাহির করিল। ক্ষেতু দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া কি কতকগুলা বকিতে লাগিল। নিতাই তা কাণেও তুলিল না···শশী শুধু ক্ষেতুর নাসিকার প্রকাণ্ড দোদুল নথটার পানে বার-বার চাহিয়া দেখিতেছিল। ঐ মুখ···নাক আছে কি না, বুঝা যায় না—শুধু ঐ নথের প্রসাদে···সে ভাবিতেছিল, পুরাণে কথিত সেই সুদর্শন-চক্র! স্থান-কাল ভুলিয়া বাই-চান্স এ-পুতনার নাকে আসিয়া আটকাইয়া গেল কি করিয়া?···

মোড় বাঁকিতে ক্ষেতুর ঘর অদৃশ্য হইল। তারিণী তখন নিতাইয়ের পায়ে পড়িল, কাঁদিয়া কহিল—আমার আশ্রয়টুকু কেড়ে নেবেন না।

আশ্রয়! আশ্রয় কাড়িয়া লইবে! বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে নিতাই তারিণীর পানে চাহিল!

দায়ে পড়িয়া তারিণীকে তখন সত্য কথা প্রকাশ করিতে হইল। সে চরণের সম্বন্ধী···কোনো কূলে তার কেহ নাই·· অন্ন নাই, আশ্রয় জোটে না—জুটাইবার সামর্থ্য নাই। তাই গালি-প্রহার-লাথি···সব সহিয়া এখানে চরণের গৃহে পড়িয়া আছে! আহার যা জোটে, বলিবার নয়। আর সর্ব্বপ্রকার বদমায়েসীতে···কি করিবে সে? একান্ত অসহায়, নিরুপায়! এখানে চরণের ফরমাশ খাটিতে আসিয়াছিল···এবং তার উপর ক্ষেত্রমণির কেমন নজর পড়ে! ক্ষেতু ভারী যত্ন করে, আদর করে, কাপড় কিনিয়া দিয়াছে, একজোড়া জুতা, এই ছাতা··· ক্ষেতু ভারী ভালো। চরণের মনে সন্দেহ হয়, তারিণীকে চরণ নিষেধ করিয়া দিয়াছে—এখানে যেন তারিণী না আসে।···কিন্তু ক্ষেতুর অত যত্ন···তাছাড়া তাকে একটু যত্ন করে, এমন লোক জগতে তার কেহ নাই!

নিতাইয়ের চিত্তে শয়তান বিজয়-গর্ব্বে নাচিয়া উঠিল! বাঃ, চমৎকার হইয়াছে!

শশীকে নির্দ্দেশ করিয়া নিতাই কহিল—এঁর বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলায় উৎপাত করতে গিয়েছিলে কেন?

তারিণী সব কবুল করিল, সবিনয়ে জানাইল, শুধু চরণের আদেশে!

নিতাই কহিল—হুঁ···তারপর কি চিন্তা করিল; করিয়া কহিল—আমি তোমাকে আশ্রয় দেবো, টাকাও দেবো, আমার একটি কাজ করতে হবে কিন্তু।

—কি কাজ ? তারিণীর বুক দুলিয়া উঠিল।

নিতাই কহিল—চরণকে আমি জব্দ করতে চাই।

তারিণী সোৎসাহে কহিল—আমি তাতেও খুব রাজী। আমাকে যে পীড়ন করে···আজ্ঞে, দায়ে পড়ে' আমি সব সয়ে থাকি !

নিতাই কহিল—তোমার ভয় নেই। আমি তোমাকে দেখবো ! কিন্তু যদি বেইমানী করো—তাহলে একখানি হাড়. আর আস্ত রাখবো না। আমি থানা-পুলিশের ভয় করি না। আমার নাম নিতাই, কি রকম দুর্দ্দান্ত···পাঁচ-জনকে জিজ্ঞাসা করে' দেখো।

নিতাই-নামটি তারিণীর অশ্রুত নয় ! সতুবাবুর আসরে এ-নাম সে বহুবার শুনিয়াছে···

নিতাইয়ের পানে চাহিয়া তারিণী কহিল—বেশ, আমি করবো, আমাকে যা বলবেন আপনি।

নিতাই কহিল,—পৈতে ছুঁয়ে বলো···

তারিণী তখনি হাতে পৈতা জড়াইল, কহিল—আপনি যা বলবেন, শুনবো···

নিতাই কহিল—বলো, কখনো বেইমানী করবে না।

মন্ত্র পড়িবার ভঙ্গিতে তারিণী কহিল—আজ্ঞে, কখনো বেইমানী করবো না।

নিতাই কহিল—আচ্ছা, এসো তাহলে এখন আমার বাড়ী··· সেখানে গিয়ে সব কথা হবে।···

ঘণ্টাখানেক বসিয়া পরামর্শাদি করিয়া নিতাই তারিণীকে বিদায় দিল, বলিল, আমার লোক তোমাকে ডাকতে যাবে…সে শুধু বলবে, প্রভু ডাকচে! আমার নাম করবে না। ব্যস, অমনি তুমি চলে আসবে। অন্যথা না হয়…

কৃতজ্ঞ চিত্তে তারিণী কহিল—আজ্ঞে, কখনো হবে না!

তারিণী বিদায় লইল। শশী কহিল—আমিও আসি। মতলব যা ফেঁদেচো…

হাসিয়া নিতাই কহিল—দাঁড়াও না, এই এক-জালে সব ব্যাটাকে ঘায়েল করবো।

—তারপর?

নিতাই কহিল—তারপর যা,…তা ভাবতে দাও। অতদূর ভাবতে গেলে কাজ করা চলে না। ক্রমে-ক্রমে ভেবে স্থির করা যাবে।

শশী কহিল—আমি তাহলে আসি।

নিতাই কহিল—এসো।

শশী চলিয়া গেলে নিতাই ডাকিল—কাশি…

কাশিম কহিল—কেন?

নিতাই কহিল—চট্‌পট্ খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে হবে রে। ওবেলায় স্কুলে যাবো তোকে ভর্ত্তি করতে…

কাশিম কহিল—আজই?

নিতাই কহিল—হ্যাঁ…শুভ কাজে দেরী করা ঠিক নয়।

স্নানাহার সারিয়া কিন্তু ওবেলার প্রতীক্ষায় থাকা গেল না। নিতাই কহিল—কি কাজ আছে রে ঘরে? কিছু নেই তো…চ' এখনি যাই। স্কুলটি আমার ভারী ভালো লেগেচে।

কাশিমের মনও তাই চাহিতেছিল! সেই কলরব, সেই আনন্দ!

সেই বারান্দা…সুমিত্রা বসিয়া কি সেলাই করিতেছে,—পাশে দুটি মেয়ে। তারাও একরাশ সূতার বাণ্ডিল পাকাইতেছে।

নিতাই আসিয়া কহিল—নমস্কার!

সুমিত্রা চাহিয়া দেখিল। তার মুখ সস্মিত হইয়া উঠিল। সুমিত্রা কহিল,—আসুন…

সুমিত্রা চেয়ার দেখাইয়া দিল, নিতাই বসিল। সুমিত্রা কহিল—হঠাৎ…

নিতাই কহিল,—হাঁ৷ একটু কাজে এলুম।

সুমিত্রা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নিতাইয়ের পানে চাহিল। নিতাইও চাহিয়াছিল…ঐ কালো দুটি চোখের তারা…ও যেন এই আঁধার-ভরা দুনিয়ার মাঝখানে আনন্দের দুটি দীপ…কি আশায়-রঙীন আলোর দীপ্তি ও দুই চোখে! ও-দৃষ্টির সামনে সারা দুনিয়ার বদ্‌রঙ যেন বদলাইয়া যায়!

নিতাই কহিল—এই ছেলেটি…এর লেখাপড়া কিছু হচ্ছে না—শুধু আমার ফরমাশ খেটে দিন কাটায়। আমি ওর সর্ব্বনাশ করচি—এ তো ভালো কথা নয়।

সুমিত্রার দুই চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। নিতাই কহিল,

—একে আজই আপনার স্কুলে ভর্ত্তি করে' নিন। বাড়ী থেকেই রোজ আসবে-যাবে। মাহিনা দেবো···অমনি পড়বে না। কেন মাহিনা দেবে না! আমি যখন দিতে পারি··এমনিতেই তো আপনাদের কত খরচ—আমি ফাঁকি দিতে চাই না।

খুশী-মনে সুমিত্রা কহিল—বেশ···বলিয়া একটি ছেলেকে কহিল,—মতিবাবুকে ডেকে আনো তো বিপিন···

মতিবাবু স্কুলের কেরাণী। ছেলেটি মতিবাবুকে ডাকিয়া আনিলে, সুমিত্রা তাহাকে বলিয়া দিল—এ-ছেলেটি ভর্ত্তি হবে··· এর নাম-ধাম সব লিখে নিন। ফ্রী নয়। এঁরা মাইনে দেবেন···

কাশিমকে সঙ্গে লইয়া মতিবাবু চলিয়া গেল। নিতাই উঠিতেছিল, সুমিত্রা কহিল,—আপনি বসুন···

নিতাই কহিল—ওর পরিচয়-টরিচয়গুলো···

সুমিত্রা কহিল—খাতা-পত্র নিয়ে মতিবাবু এইখানেই আসবেন।

তাহাই হইল। দু'একটি কথার পর নিতাই কহিল,—আমি যদি আপনাদের ফণ্ডে মাসে-মাসে কিছু দিতে চাই, নেবেন?

সুমিত্রা কহিল,—দরকার নেই। তার চেয়ে আপনি এদের খেলা-ধূলার আয়োজন করুন। আপনি নিশ্চয় স্পোর্টস্-ম্যান্···

হাসিয়া নিতাই কহিল—চেহারা দেখে তাই মনে হয়? এককালে চর্চ্চা করেছি বটে···যখন কলকাতায় থাকতুম! তারপর চারিধার থেকে আত্মীয়-স্বজনরা খশে' সরে' পড়লো··· এমন অকস্মাৎ···মন বিগড়ে গেল! লেখাপড়া, খেলাধূলা—

সব ছেড়ে গাঁয়ে এসে বসলুম! এসে দেখি, এখানে চারিদিক জঞ্জালে ভরা! সে-জঞ্জাল সরাতে গেলুম…পারলুম না! লোকগুলো ঐ জঞ্জাল আঁকড়েই থাকতে চায়! জঞ্জাল সরাতে গেলে বিভ্রাট বাধে। ধুত্তোর বলে' ঘরে এসে বসলুম। যা মনে আসে, তাই করি…স্রেফ্ indolent life!

প্রাণ-খোলা কথা। এ-কথায় সুমিত্রা চমৎকৃত হইল! সে কি বলিতে যাইতেছিল, তার পূর্ব্বেই নিতাই কহিল,—দৈবাৎ এধারে মাছ ধরতে এসে আপনার স্কুল দেখলুম! আপনাকে দেখলুম…যেন শ্বেত কমলদল-বাসিনী বাণী দেবী! মন সেই-ইস্তক কাজ চাইছে। জীবন যেন নূতন মূর্ত্তি নিয়ে জেগে উঠেচে! কুড়ের মতো পড়ে' থাকার জন্য জীবন নয়! যা-তা করে' কাটিয়ে দেবারও নয়। মানুষের অনেক কাজ করবার আছে।…বিশেষ, আপনার এই কাজে যদি যোগ দিতে পারি—আপনাদের কাজে মনের যোগ স্থাপন করবার সুযোগ যদি পাই, তাহলে আমি বেঁচে যাই যেন।

সুমিত্রা কহিল—শুনে ভারী আনন্দ হলো। কাজের লোক দরকার। আমি একা…আরো দু'এক জায়গায় চেষ্টা করেচি…কিন্তু কেবলই বিদ্রূপ পেয়েচি।…শুধু বিদ্রূপ নয়…

সুমিত্রা থামিল, পরে গম্ভীর স্বরে কহিল—ইতর টীকা-টিপ্পনীরও অভাব ঘটেনি! সকলে বলে, মেয়ে-মন্দ!

নিতাই গর্জ্জিয়া উঠিল—হতভাগা দেশ! পুরুষগুলো এ-গ্রামে মেয়েদের চেয়ে অধম হয়ে আছে। নিজেদের ভালো

নিজেরা করবে না কখনো। অপরে ভালো করতে এলে, তাতেও সর্ব্বরকমে বাধা দেবে !

বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল, সেই সলীমের ছেলের জ্বর একটু কমিয়াছে। সে একটু ভালো আছে !

সুমিত্রা কহিল—চলুন, আপনাকে সব দেখাই। একটি ছেলে বাড়ীতে অসুখে ভুগছিল—তাকে এখানে এনে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েচে !

নিতাইয়ের মনে আনন্দের বান ডাকিল। প্রাণের আবেগে সে কি বলিতে যাইতেছিল, সহসা নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইল।

সুমিত্রা ডাকিল—আসবেন ?

—নিশ্চয়···

দুজনে চলিল। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড। ডাক্তারখানায় সলীমের ছেলেকে দেখিয়া ফিরিবার সময় সুমিত্রা সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—ও কে ?

একটা বড় গাছের দিকে সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। নিতাই চাহিয়া দ্যাখে, একজন লোক। ভদ্র বেশ। গাছের আড়ালে আত্মগোপন করিতেছে।

কে ? মনে কেমন সন্দেহ আসিল। কেহ কোনো মন্দ অভিপ্রায়ে...

নিতাই গূঢ়ভাবে গাছের দিকে চলিল। লোকটা···

নিতাই ছুটিয়া গিয়া তার হাত ধরিল, সবিস্ময়ে ডাকিল—শশী···

তাই। শশী। নিতাই কহিল—লুকোচ্ছো যে?

—লুকোবো কেন? ··এমনি এসেছিলুম···

—লুকোবার কিছু নেই, সত্যি। এসে যা দেখছি,—চমৎকার! কাশিকে আজ স্কুলে ভর্ত্তি করে' দিলুম।···

কথার সঙ্গে-সঙ্গে শশীর হাত ধরিয়া নিতাই তাকে একেবারে টানিয়া লইয়া চলিল। সুমিত্রা স্তম্ভিতের মতো' দাঁড়াইয়া। নিতাই কহিল—শত্রুপক্ষ নয়···মিত্র। আমার সেই বন্ধু, শশী।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শয়তান

আরো সাত-আট দিন পরের কথা···

বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। সুমিত্রা নিস্পন্দ বসিয়া আছে। তার সামনে দাঁড়াইয়া বিজলী। বিজলীর মুখে-চোখে উদ্বেগ। চারিদিক স্তব্ধ···শুধু সুদূর আকাশচারী দু'একটা চিলের চীৎকার মাঝে-মাঝে সেই স্তব্ধতার গায়ে ভাসিয়া উঠিতেছে।

বিজলী কহিল,—না হলে' আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ চূরমার হয়ে যাবে। মাসখানেকের জন্য শুধু···আমাকে রক্ষা করো, সুমিত্রা।

বিজলী একেবারে সুমিত্রার পায়ের উপরে লুটাইয়া পড়িল।

সুমিত্রা কহিল,—কি করো, বিজলী! ওঠো।

বিজলী তবু ওঠে না!

সুমিত্রা বলিল,—আঃ—পা ছাড়ো।

বিজলী কহিল,—ঐ স্কুল-ফণ্ডের প্রায় আড়াই হাজার টাকা তোমার কাছে আছে, পরশু ডাকে এসেচে, আমি জানি। তা থেকে শুধু এক হাজার···এক মাসের জন্য··· আমাকে দাও···ধার। তোমাদের এখনো তিন মাস দেরী বাড়ী তোলবার। এক মাসের মধ্যেই আমি এ-টাকা শোধ করে' দেবো।

সুমিত্রা কহিল—কিন্তু ও-টাকায় আমার কি অধিকার? পরের টাকা…ও-থেকে কি করে' তোমায় ধার দি? এ যে কত-বড় অন্যায়…

বিজলী কহিল,—তুমি এ-টাকা চুরি করচো না, খরচ করচো না…তোমার বাক্সে এ ক'মাস অকেজো পড়ে' থাকবে…কোনো দরকারে লাগবে না। আর এই একমাস…ও-টাকা যদি আমার কাছে থাকে, তোমার লোকসান নেই,—অথচ আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে তাতে…উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ! একমাসের মধ্যেই আমি এ-টাকা শোধ দেবো। তার নড়চড় হবে না।

সুমিত্রা কোনো কথা কহিল না। বিজলীর কাকুতির অন্ত নাই। সুমিত্রা তবু অবিচল। শেষে বিজলী এক কাজ করিল। দেওয়ালের গায়ে একখানা বড় খুর্পী টাঙানো ছিল, দেওয়ালের শোভার জন্য এবং বিপদে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেও বটে,—বিজলী চট করিয়া সেটা হাতে লইয়া থিয়েটারী-ভঙ্গীতে কহিল,—এটুকু দয়া যদি না করো, তাহলে আমি বাঁচবো না…এই খুর্পী বুকে বসিয়ে সব শেষ করে' দেবো। যদি জীবনের এমন সুযোগ হারাই, তাহলে কি কাজ এ-জীবনে…

কথাটা বলিয়া বিজলী বুকের উপর খুর্পী ধরিল।

সুমিত্রা দেখিল। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, কহিল,—কি করো? আঃ!

বিজলী তেমনি অভিনয়ের ভঙ্গীতে কহিল,—এছাড়া আর কোনো উপায় নেই, সুমিত্রা…

সুমিত্রা খুর্পী কাড়িয়া লইল। বিজলী কহিল,—এ জীবন শেষ করতে আরো হাজার পথ খোলা আছে। সে পথ তো তুমি বন্ধ করতে পারবে না।...

বিজলী থামিল, পরে স্বরে আরো চমক লাগাইয়া কহিল,—যার ভবিষ্যৎ নেই, তার জীবনে কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না।...এ জেনেও তুমি অটল...কিন্তু এর জন্য তুমিই হবে দায়ী সুমিত্রা।

বিজলীর দুই চোখে জল দেখা দিল। সে গমনোদ্যত হইল।

সুমিত্রার বুকের মধ্যে যা হইতেছিল...সে ডাকিল,—বিজলী...

বিজলী ফিরিল।

সুমিত্রা কহিল—এ পরের টাকা...

বিজলী বলিল—আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না? শুধু একমাস ...এ-টাকা জমা দিলে আমি কেশিয়ারী চাকরিটা হাতে পাই। পাঁচশো টাকা মাহিনা।...কাজে বাহাল হলে' এক-মাসে পাঁচশো টাকা মাহিনা আগাম চাওয়া শক্ত হবে না। আর...চাইলে তা পাবোই। লক্ষ্মীটি, দয়া করো, সুমিত্রা... আমায় রক্ষা করো...

সঙ্গে-সঙ্গে সুমিত্রার পায়ে আবার সে লুটাইয়া পড়িল।

সুমিত্রার পায়ের তলা হইতে বিশ্ব-ভুবন কোথায় সরিয়া যাইতেছিল! সেই বিজলী...

সুমিত্রা চাহিয়া দেখে, বিজলীর চোখে জল! সুমিত্রার

মন দুলিল। সে কহিল—ঠিক এক মাসে দেবে? কিন্তু পরের টাকা···আমার বুক কাঁপচে!

বিজলী কহিল—আমি পাকা লেখাপড়া করে' দিচ্ছি।

নারীর মন! সহস্র কর্ত্তব্যের মধ্যেও মমতা সে ছাড়িতে পারে না! চোখের জলে তার মনের মাটি ভিজিয়া যায়!

যন্ত্র-চালিতের মতো ঘরে গিয়া সুমিত্রা সিন্দুক খুলিল···এবং একতাড়া নোট···

তার মাথা ঘুরিতেছে, চোখে সে অন্ধকার দেখিতেছে!···

সেই অন্ধকারের আবছায়ার মধ্যেই বিজলী কাগজ লইয়া তাহাতে কি-সব লিখিল। লিখিয়া সুমিত্রার চোখের সামনে ধরিল···বিজলীর মুখে কৃতজ্ঞতার গদগদ বচন···ভগবানের নাম! সে যেন বিদ্যুতের ঝলক বহিয়া গেল!···

তারপর যখন সচেতন সুমিত্রার চোখের সামনে বিশ্বভুবন আবার তার স্বরূপে দেখা দিল, তখন বিজলী চলিয়া গিয়াছে, এক-হাজার টাকার বদলে পড়িয়া আছে একখানা হ্যাণ্ডনোট··· টিকিটের উপর বিজলীর নাম সহি। সহিতে সেই অপূর্ব কায়দা। সে যেন বিদ্রূপের হাসি!

সেটা সুমিত্রার হাতে···তার চোখের সামনে আলো আবার নিবিয়া গেল···মাথা ঘুরিল। কাছে একখানা চেয়ারে অবসন্নের মত সুমিত্রা বসিয়া পড়িল। বসিয়া চক্ষু মুদিল।···

নিতাইয়ের আহ্বানে সুমিত্রা চোখ মেলিয়া চাহিল। চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। একটা বড় নিশ্বাস কিছুতেই সে রোধ করিতে

পারিল না। এতক্ষণ সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল! স্বপ্ন মিলায় নাই! আলোয়-আলো ঘর···সে আলোয় কালো-কালো কি উড়িতেছে!

নিতাই কহিল—ও-লোকটা কেন এসেছিল? ঐ সুট্-পরা বাঙালী সাহেব?

সুমিত্রা কহিল—বিজলী।

নিজের স্বরে নিজেই সে চমকিয়া উঠিল। এ যেন কোন্ পাতালের অতল তল হইতে আর-কে কথা কহিল!

নিতাই কহিল—যে-ই হোক, ও ভয়ানক রেশ-বাজ···

রেশ-বাজ! সুমিত্রার চোখে বিস্ময় ও আতঙ্ক···সীমাহীন পাথারের মতো!

নিতাই কহিল—ও আর ঐ মিলের অচিন্ত্য—দু'জনে ভারী ভাব। কলকাতার মাঠে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার স্বপ্ন দেখে ওরা দিবা-রাত্র। চাকরি খুইয়েচে—ক্যাশ্ ভেঙ্গেছিল বলে'। তারা ছাড়বে কেন? কাণ ধরে' আদায় করে' নিয়েচে···পুলিশে খবর অবধি দিয়েছিল!

তাই! তাই!

সুমিত্রার পায়ের তলা হইতে দুনিয়া সরিয়া যাইতেছিল··· সে যেন কোন্ অন্ধকার রসাতলে নামিয়া চলিয়াছে!

পায়ের নীচে আশ্রয়ের চিহ্ন নাই!

সুমিত্রা কহিল,—কত টাকা দিতে হয়েচে জানেন?

নিতাই কহিল,—শুনেচি হাজার-বারোশো টাকা!···কিন্তু ও

কি···আপনার মুখ যে সাদা হয়ে গেল !···এর মানে ? আপনার আত্মীয় ?

নিশ্বাস চাপিয়া সুমিত্রা কহিল,—একরকম আত্মীয়ই ! কিন্তু এমন উৎসন্ন গেছে ! এ আমার স্বপ্নের অগোচর···

সুমিত্রার মাথা ঘুরিতেছিল ! সে আবার চক্ষু মুদিল।···

পনেরো দিন পরের কথা।

এ পনেরো দিন সুমিত্রার কি ভাবে কাটিয়াছে, তা শুধু তার অন্তর্যামীই জানেন ! নিতাই নিত্য আসে। তার সঙ্গে সুমিত্রার অনেক কথা হয়। এসব কথার অন্তরালে বেদনার কাঁটায় খোঁচ ! সুমিত্রার রক্তাক্ত মনের পরিচয় নিতাইয়ের অজ্ঞাত রহিল না ! তবে কিসের বেদনা, এটুকুই জানা গেল না। সে প্রশ্ন নিতাই কোনো দিন করিতে পারিল না···কেমন এক দ্বিধায় কণ্ঠ তার রুদ্ধ হইয়া আসে ! অথচ জানিবার কী আগ্রহ !

সেদিনও কথা-বার্ত্তা হইতেছে···এমন সময় ডাক আসিল। টাইপ-করা বড় একটা খাম। হাতে লইতে সুমিত্রা কাঁপিয়া উঠিল। চিঠি খুলিয়া পড়িল···সর্ব্বনাশ ! সে অস্ফুট আর্ত্ত রব তুলিল। নিতাই তার পানে চাহিল।

সুমিত্রা কহিল,—কি হবে ? এঁ্যা···

কথা শেষ হইল না। নিতাই তার পানে চাহিল।

সুমিত্রার মুখ বিবর্ণ—যেন সে ভূত দেখিয়াছে, এমনি আতঙ্কে পরিপূর্ণ ! চিঠিখানা সুমিত্রা তার হাতে আগাইয়া দিল।

নিতাই চিঠি পড়িল। মিশন্ হোম্ হইতে চিঠি আসিয়াছে। সাহেব লিখিয়াছেন, এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতিকে লইয়া কালই তিনি ফুলছড়িতে আসিতেছেন।...

সুমিত্রার দু' চোখে জল। সুমিত্রা কহিল,—উপায় ?

নিতাই কহিল,—আমাকে সব কথা বলতে পারেন। আমি আঁচে যেন কিছু বুঝচি ! কিন্তু...

সুমিত্রা সব কথা খুলিয়া বলিল...বিজলীর সঙ্গে তার কি সম্পর্ক, তাও গোপন রাখিল না !

শুনিয়া নিতাই কহিল,—বটে ! আমি উপায় দেখচি।...

কিন্তু ওদিকে বিপদ বাধিল ! তারিণীর সাহায্যে যে জাল পাতিয়াছে,...সে জাল আজ গুটানো চাই। নহিলে সে-কাজ ফাঁশিয়া যাইবে। অথচ বিজলীকেও চাই, আজই...দুটোই সমান শয়তান ! দুটোকেই আয়ত্ত করা চাই।

সুমিত্রার দু'চোখে জলের বিরাম নাই।

নিতাই কহিল,—ভয় নেই। আমার শক্তিতে বিশ্বাস হচ্ছে না ?...বেশ, প্রমাণ পাবেন। আমি তাহলে বসবো না। এখনি চলি তার সন্ধানে।

নিতাই উঠিল। উঠিয়া গৃহে ফিরিয়া সে দেখে, তারিণী আসিয়া বসিয়া আছে।

তারিণী কহিল,—চরণকে ক্ষেতু রাজী করিয়েছে, ক্ষেতুর সেই বোন্‌ঝী এসেছে। তার এক ছেলে...সেই ছেলের অন্নপ্রাশন

আজ। ক্ষেতুর বাড়ীতেই হবে। খরচ-পত্র চরণ দিচ্ছে। সব ঠিক। এ থেকে কায়দা করা সম্ভব হবে না?

নিতাই কি ভাবিল, ভাবিয়া মুখে হাসি ফুটাইয়া কহিল,—ঠিক হয়েচে। এক কাজ করো তারিণী···

তারিণী নিতাইয়ের পানে চাহিল। নিতাই কহিল,—চরণ ওখানে দেখা-শুনা করতে থাকবে নিশ্চয়?

তারিণী কহিল,—নিশ্চয়! আমিই বাজার করে' দিয়েচি। ক্ষেতু বললে, আজই খাওয়া-দাওয়া। চরণকে সে বলেচে। চরণ রাজী না হয়ে করে কি! ক্ষেতু যে কাণ্ড বাধিয়েছিল···উঃ, কলকাতার থিয়েটার দেখেচেন? একেবারে যেন সেই থিয়েটারের সেরা এ্যাকট্রেশের ভঙ্গী।

সোৎসাহে তারিণীর পিঠ চাপড়াইয়া নিতাই কহিল,—ঠিক হয়েছে। এক কাজ করো তারিণী···ক্ষেতুকে ঠিক রাখো, আব্দার ধরে' থাকে যেন! এই আনন্দের কাজে চরণকে ওখানে পোলাও খাওয়াতে হবে। তারপর···

তারিণী কহিল,—বেশ, আমি তাহলে এখন যাই। রাত্রে ভোজ।

নিতাই কহিল,—হ্যাঁ, তুমি যাও। ক্ষেতুকে দিয়ে এই কাজটি করাতেই হবে—যেমন করে' পারো। একাজ যদি পারো, তাহলে কেল্লা মার দিয়া।···তুমি শুধু এসে আমাকে খপরটুকু দিয়ে যাবে—তারপর যা করবার, আমি করবো।

তারিণী খুশী-মনে চলিয়া গেল।

নিতাই ডাকিল,—শশী…

শশী অদূরে বসিয়া নভেল পড়িতেছিল, কহিল,—কি ?

শশীকে নিতাই সব কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া শশী তার পানে চাহিল।

নিতাই কহিল,—সদুবাবুকে খপরটুকু দিতে হবে। তারপর যত চাঁই-মশাইকে ও-বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারলে, চরণের মরণ সুনিশ্চিত। যেমন ব্যাটা ছুঁচো পাজী…

শশী কহিল,—তা বলে' বামুনের জাত মারবে ?

হাসিয়া নিতাই কহিল,—জাতের কি আছে ওর ? ক্ষেতুর হাতের অন্ন মুখে দিলেই বুঝি জাত যায় ? অথচ ওর ঘরেই চরণের বাস! জাতবিচারের চমৎকার আইডিয়া তোমার!

শশী কহিল,—তা বটে!

সদু লোকটির সহস্র দোষের মধ্যে একটি গুণ আছে—জাতের ব্যাপারে ভণ্ডামি করে না। দয়ামায়াবর্জ্জিত দুর্দ্দান্ত হইলেও জাতের সংস্কার বাঁচাইয়া চলে। চরণের সম্বন্ধে যে-কুৎসা রটিয়াছে, অতিরঞ্জিত ভাবিয়া সদু তাকে ক্ষমার চক্ষে দেখে।

নিতাই কহিল,—আমি একবার বেরুচ্ছি। তারিণী ফিরলে তাকে বসিয়ে রেখো। আমার সঙ্গে দেখা না করে' সে যেন চলে না যায়। কাজটি সুসম্পন্ন করা চাই। আজ রাত্রে। এমন সুযোগ আর মিলবে না।

হাসিয়া শশী কহিল,—কাজ সুসম্পন্ন হবে।

—বেশ। বলিয়া কাঁধে উড়ানি ফেলিয়া নিতাই বাহির হইবার উদ্যোগ করিল।

শশী কহিল—কোথায় চললে?

নিতাই কহিল,—আর-এক শয়তানের সন্ধানে। এটাও ভদ্রবেশী শয়তান। এর চাল আর-এক কাঠি উপরে···

কথার অর্থ না বুঝিয়া শশী নিতাইয়ের পানে চাহিয়া রহিল। নিতাই কহিল,—কৌতূহল একটু সম্বরণ করো—পরে সব জানতে পারবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিদ্যাদিগ্‌গজ

সারাদিন পাতি-পাতি খুঁজিয়াও বিজলীর সন্ধান মিলিল না। যে-মিলে সে চাকরির কথা বলিয়াছিল, সেখানে সন্ধান লইতে সংবাদ মিলিল, বিজলীর চাকরি এখানে হয় নাই। সাহেব তাকে দুদিন পরখ করিয়াই জবাব দিয়াছে।

সন্ধ্যার পর নিতাই স্কুলে ফিরিল। সুমিত্রা?...

ঘরে বিছানায় দেহ-ভার লুটাইয়া সুমিত্রা পড়িয়া আছে। নিতাই দেখিল, তাকে ডাকিল না;...নিঃশব্দে বারান্দায় আসিয়া বসিল।

স্তিমিত আলোয় ছেলে-মেয়েরা ছায়া-মূর্ত্তির মতো খাওয়া-দাওয়া সারিয়া পড়িতে বসিল। নিতাই তেমনি কাঠ হইয়া বসিয়া আছে। প্রহরের পর প্রহর বহিয়া চলিয়াছে।...

রাত্রি সাড়ে ন'টা—জ্যোৎস্নায় চারিধার ভরিয়া গিয়াছে। সুমিত্রা উঠিয়া বারান্দায় আসিল, আসিয়া নিতাইকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

নিতাই কহিল—সে আগাগোড়া মিথ্যা কথা বলেছে। ও-মিলে তার চাকরি নেই।

সুমিত্রা কহিল,—আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

—তার পর?

—হুঁ। সে বলেচে, জেল বাঁচাতে সে-টাকা খরচ হয়েছে! তার হাতে কিছু নেই। টাকা এখন সে দিতে পারবে না।

এমনি সাফাইয়ের কথাই নিতাই ভাবিয়াছিল। সুমিত্রা কহিল—তার উপর সে হাঁকিয়ে দেছে। বলে,—এক মাসের কড়ারে টাকা নিয়েছে—পনেরো দিনের কড়ারে নয়! এক মাস পরে টাকা না পাও, নালিশ করো।

বিষম রোষে জ্বলিয়া নিতাই একেবারে লাফাইয়া উঠিল, কহিল—কোথায় সে শয়তান?

সুমিত্রা কহিল,—ষ্টেশনের কাছে তার এক বন্ধুর বাড়ী—সেইখানে সে আছে। বন্ধুর নাম, অক্ষয়বাবু। কাল সকালে কলকাতায় যাবে।

—পালাবে? ওকে পালাতে দিচ্ছে কে? বলিয়াই নিতাই উঠিল। সুমিত্রা কহিল,—কোথায় যাচ্ছেন?

—সেই অক্ষয়ের বাড়ী। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।··· এখনো ক'ঘণ্টা সময় আছে, এ-সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করি। কিন্তু তার আগে শশীর একটা বরাত আছে।

সুমিত্রা নিষেধ তুলিতেছিল, সে-নিষেধ তোলার পূর্ব্বেই নিতাই বীর-দর্পে দীর্ঘ দেহ লইয়া সরিয়া পড়িল। তাই তো,—ক্ষেতুর গৃহে আর-এক শয়তানের খোলস ছিঁড়িবার আয়োজন বেশ পাকা করিয়া তোলা হইয়াছে। সে-কাজের এমন সুযোগ আর মিলিবে না! তারিণী, শশী প্রভৃতি সেখানে তার প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া আছে। বিজলীকে ধরিবার পূর্ব্বে সেখানে যাওয়া

প্রয়োজন। বিজলী তো কাল সকালে কলিকাতায় পলাইবে—তাকে ধরিবার সময় এখনো নিঃশেষ হয় নাই! অথচ ক্ষেতুর গৃহে অন্ন-উৎসব···রাত প্রায় দশটা বাজিতে চলিল···এই তো মাহেন্দ্র-ক্ষণ।···

গতির বেগ দ্রুত করিয়া নিতাই বাগ্দীপাড়ার পথে চলিল। মাথার উপর আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না—বাতাসের দোলায় গাছের পাতায় মৃদু মর্ম্মর!

দূর হইতে অস্পষ্ট কলরব শোনা গেল। ঐ ক্ষেতুর গৃহ।···

নিতাই আসিয়া দেখে, বাহিরে এক গাছতলায় শশী ও তারিণী দাঁড়াইয়া আছে। নিতাইকে দেখিয়া তারিণী কহিল—আমি ভিতরে যাবো না। তবে ক্ষেতুকে সাফ বলেচি, এ-কাজ যদি না পারো তো এ গাঁ থেকে আমায় বাস তুলে যেতে হবে। ক্ষেতু দিব্যি গেলেচে, চরণকে তার অন্ন সে খাওয়াবেই।

নিতাই কহিল,—সদু বাঁড়ুয্যেদের খপর দিয়েচো শশী?

শশী কহিল,—উড়ো-চিঠি দিয়েছি। তাছাড়া সদুর এক মাসতুতো ভাই আছে না···রমানাথ? তাকে লোভ দেখিয়েচি, দিনের বেলায় ঐ পাদ্রীদের ইস্কুল দেখতে যাবো। সে ভাব করতে চায় সুমিত্রার সঙ্গে···

নিতাই কহিল,—তার মানে?

শশী কহিল,—বেচারীর চাকরি নেই। বি-এ ফেল করে' সে এসে সদুকে ধরে, কিছু টাকা ধার দাও···ব্যবসা করবো। তা, সদু বলেছে, ধার দিতে রাজী আছে, রমানাথের একটু জমি আছে

কলকাতায়, সেই জমি যদি সত্থর কাছে রমানাথ বন্ধক রাখে। ঐ জমির উপর সত্থর ভীষণ লোভ। বেচারী বলছিল, এ-চাকরি যদি পায়, তাহলে আর সত্থর বিষয়-বুদ্ধির মধ্যে তাকে সেঁধুতে হবে না! অর্থাৎ ঐ জমির লোভে রমানাথকে সত্থ একটু যত্ন-আত্তিও করচে দুদিন।

নিতাই কহিল,—কি করে' সে জানলে, আমরা স্কুলে যাই?

শশী কহিল,—সেখানে সে একদিন আমাদের দেখেছিল।...

নিতাই কহিল,—তা, রমানাথ কি করবে?

শশী কহিল,—সত্থর দলকে গিয়ে সে বলেচে,—চরণ ভটচায্যি সকলের নাম ডুবুলো—ক্ষেতুর ঘরে আজ নেমন্তন্ন খাচ্ছে! সত্থ বলেচে,—স্বচক্ষে সে দেখতে চায়। রমানাথ এতক্ষণ এখানে ছিল,—দশ-বারো মিনিট হলো, সত্থদের ডাকতে গেছে।

—বেশ। বলিয়া নিতাই তারিণীর পানে চাহিল, কহিল,—এ-যজ্ঞ আমরা দেখি কি করে'?

তারিণী কহিল,—চুপি-চুপি আসুন···আমি ব্যবস্থা করেছি। ক্ষেতুর ঘরের পাশে ঢেঁকিশালে একটা কাপড় টাঙিয়ে রাখা হয়েচে—পর্দ্দার মতো। ওদিকে ছোট জানলার গরাদ ভাঙ্গা—সেদিক দিয়ে ঢেঁকিশালে ঢুকে আমাদের বসে' থাকতে হবে।... আসুন আমার সঙ্গে···

নিতাই কহিল,—তারপর সত্থরা এলে···

তারিণী কহিল,—আমি বাইরে থাকবো—খপর দেবো।

ক্ষেতুকে ইসারা করলেই চরণের সামনে সে ভাতের থালা এগিয়ে দেবে।

নিতাই ও শশীকে লইয়া তারিণী ঢেঁকিশালে ঢুকিল।···উঠানে কুটুমের দল আহারে বসিয়াছে। চরণ চুপ করিয়া ক্ষেতুর ঘরে তক্তাপোষে বসিয়া তামাক টানিতেছে।···তারিণী দ্বারে করাঘাত করিল। শুনিয়া ক্ষেতু সন্তর্পণে বাহিরে আসিল।

তারিণী মৃদু-স্বরে কহিল,—শুভ কাজে আর বিলম্ব কেন, ক্ষেতুরাণী?

হাত নাড়িয়া ক্ষেতু কহিল,—তোমার কথায় বামুনের জাত মারচি! এর পরে তুমি যেন আমায় পায়ে ঠেলো না···দেখো।

তারিণী ঘাড় নাড়িয়া কহিল—না···না···না···তিন সত্যি করছি।

তারিণী নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল। ক্ষেতু ঘরে গিয়া চরণকে কহিল—তোমার ভাত আনি।

চরণ চমকিয়া উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া কহিল,—ভাতটা ত আমার তৃপ্তি, খাইয়ে তোমার তৃপ্তি—দু'নম্বর তৃপ্তি হয়ে যাবে।

ক্ষেতু কহিল,—ও-সব ভিটকেলমি আমি শুনছি না। আজ একটা আমোদের কাজ··এতে যদি বাগড়া তোলো, তাহলে সত্যি বলচি, আমি তোমার মুখ দর্শন করবো না।

চরণ হতাশ দৃষ্টিতে ক্ষেতুর পানে চাহিল!

ক্ষেতু কহিল,—আমার কাছে বাম্‌নাই ফলিয়ো না ঠাকুর। আমি তামাক সেজে দিচ্ছি, হুঁকোয় জল আছে—সে জল আমার

ছোঁওয়া। আগুন আর জল···দুই আছে তার। সঙ্গে তামাক আর টিকে, কেমন তো? পোলাওতেও ঐ আগুন আর জল—শুধু তামাক-টিকের বদলে চাল আর মশলা—এই না!···তবে?

চরণ কহিল,—এটা কাষ্ঠ-সংযোগে কি না···কথায়, বলে, বৃহৎ কাষ্ঠে জাত যায় না।···

হাসিয়া ক্ষেতু কহিল,—আচ্ছা বাবু, পিঁড়িতে বসে' খেয়ো··· কাঠের যোগ থাকবে তাহলে। না খেলে আমি মাথা খুঁড়ে মরবো···সত্যি! কে আর জানবে? শুধু তুমি আর আমি···

চরণ কহিল,—আমায় আজ বঙ্কিমবাবুর সেই বিদ্যাদিগ্‌গজ না সাজিয়ে আর ছাড়বে না, দেখচি! যাক্, মহাজনের পথ। তার ছিল আশমানি, আমার আছো তুমি!

—সে আবার কি?

চরণ কহিল,—সে এক মজার গল্প···বলবো'খন। এখন নাও···ছাড়বে না তো···তোমার সন্তোষের জন্য কি না করতে পারি!—মোদ্দা চুপি-চুপি···বুঝলে ক্ষেতু···আর পাঁচ বেটা-বেটি জানতে পারলে···

—ভয় নেই গো ঠাকুরমশাই, সে জ্ঞান আমার আছে। বামুনের জাত মারচি জানলে এ-গাঁয়ে কি আর আমাকে কেউ আস্ত রাখবে? সে-ভয় আমার নেই?

ক্ষেতু চলিয়া গেল। চরণ বসিয়া চালের বাতা গণিতে লাগিল।

নিতাই ও শশী কথাগুলা শুনিল। শশীর গায়ে ঠ্যালা দিয়া নিতাই কহিল,—সমাজপতির কাণ্ড দেখচো?

শশী কহিল—চুপ!

ক্ষেতু থালায় অন্ন বাড়িয়া আনিল—মাটীর ভাঁড়ে ঝোল, থালায় নানা তরকারী ব্যঞ্জন।

ক্ষেতু কহিল,—খাইয়ে দি, হাতটা নাই বা এঁটো করলে!—তাছাড়া হাতে গন্ধ থাকবে! শুধু মুখ দিয়ে খাওয়া বৈ তা নয়। আঁচিয়ে পাণ আর তামাক খেলেই চুকে যাবে।

চরণ কহিল—খুব বুদ্ধি বার করেচো! কিন্তু দোরে খিল দাও ক্ষেতু, কেউ যদি এসে পড়ে?

ক্ষেতু কহিল,—কেউ আসবে না···ভয় নেই। তাছাড়া কেউ আসে যদি, ভাববে, আমি খাচ্ছি! আমার হাত এঁটো—তোমার হাত খালি দেখবে তো! তুমি ঐ তক্তাপোষে বসে থাকো—আমি গেরাস তুলে তুলে তোমার মুখে দি।

তাহাই হইল।

নিতাইয়ের অস্বস্তির সীমা নাই। সে ওদিকে প্রহর গণিতেছে ···সতুবাবুরা কখন্ আসিবে!

চরণ আরামে গ্রাস লইতেছে। ক্ষেতু কহিল—কেমন রান্না হয়েচে?

চরণ কহিল—চমৎকার। এমন কখনো খাইনি, ক্ষেতু—সত্যি বলচি। কে রাঁধলে?

ক্ষেতু কহিল—আমার বোনঝী-জামাই। সে হুগলিতে এক সাহেবের বাবুর্চ্চি—রান্না-বান্না জানে।

চরণ কহিল,—বিলিতি খানা! ও···তাই বলো! এমন খানা

খায় বলেই না এরা রাজত্ব করচে! আর আমরা যেমন বেগুন কাঁচকলা খাই, তেমনি দাসত্ব করে মরচি।

ভোজ্যের স্বাদে চরণ জাতের কথা ভুলিয়া গেল। মাংস খাইতে খাইতে চরণ কহিল,—দাঁতের সে জোর নেই ক্ষেতু··· নাহলে···আচ্ছা, তোমার এই বোন্‌ঝী-জামাইটি কিছু দিন আছে তো এখনে?

ক্ষেতু কহিল,—না। ছুটী মেলে কৈ? কাল্‌ বিকেলে ও চলে যাবে।

একখানা হাড় চিবাইবার লোভ চরণ ছাড়িতে পারিল না। ···কাজেই তক্তাপোষ হইতে নামিয়া হাত দিয়া সেটাকে বাগাইয়া ধরিল, ধরিয়া তাহাতে দিল কামড়।

বেচারী! সহসা দ্বারপ্রান্তে স্বর ফুটিল,—ইস্‌···এ যে রীতিমত মহোৎসব লাগিয়েচো হে চরণ!

এ কণ্ঠ?···চরণ চমকিয়া উঠিল। কম্পিত হাত হইতে ছাগলের হাড় পড়িয়া গেল। চাহিয়া চরণ দেখে, সর্ব্বনাশ! দ্বারে দাঁড়াইয়া সদু বাঁড়ুয্যে, রমানাথ এবং···কে যে নাই! ক্ষেতু কি ইহাদেরও নিমন্ত্রণ করিয়াছে?

সদু কহিল,—খুব বামুন তুমি! বাঃ!

নিতাই এবং শশী ঢেঁকিশাল হইতে বাহিরে আসিল।

নিতাই কহিল,—আমরা সাক্ষী, বাঁড়ুয্যে মশাই। এই চরণকে দিয়ে দেশ-শুদ্ধ সকলের জাত মারচেন আপনি। এর সামাজিক বিহিত যদি না হয়, আমরা কাছারিতে

নালিশ করবো। জাত-মারার অপরাধে শুনেচি জেলও হয় নাকি!

সন্থ কহিল,—আমিও। ছাড়বো না হে। এর বিহিত আমি করবোই।···চরণ···

আর চরণ! চরণ একেবারে মাটীতে মিশিয়া গিয়াছে!

মাথায় ঘোমটা টানিয়া সলজ্জ ভঙ্গীতে ক্ষেতু পাশ কাটাইয়া ঘর হইতে ইতিমধ্যে কখন সরিয়া পড়িয়াছে···

নিতাই কহিল,—এর বিহিত যদি না করেন, তাহলে আমরা উপায় দেখবো। ঐ পাদ্রীদের ধরবো···জাত যদি যায়, তাহলে আমরা খৃষ্টান হবো!

সন্থ কহিল,—এইখানেই তুমি থেকে যাও চরণ। গাঁয়ে আর ও হাড়-চোষা মুখ দেখিয়ো না। দেখালে তোমাকে রক্ষা করবার সাধ্য থাকবে না আমার।

নিতাই কহিল,—ওঁকে সৎপরামর্শই দিয়েচেন! তা উনি রাজী। উনি নিজেই বলছিলেন, উনি নাকি বিদ্যাদিগ্‌গজ আর ক্ষেতু হলো ওঁর আশমানি!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভাগ্য-চক্র

রাত্রেও নিতাইয়ের আর দেখা নাই!···রাত্রিটা সুমিত্রার যে-বিভীষিকার মধ্যে কাটিল···বুঝি নরক-যন্ত্রণা বলিয়া যে কথা আছে, সে নরক-যন্ত্রণাও ইহার কাছে অতি তুচ্ছ!

সকালে সেই রৌদ্র, সেই বাতাস! তবু দুনিয়ার মুখের কালি আর ঘোচে না!···সাহেবের আসিবার কথা ন'টায়।···নাই, উপায় নাই,···কোনো উপায় নাই! মুখে এই কালি মাখিয়াই তাঁদের সামনে দাঁড়াইতে হইবে!

তাই হোক্! নিজের মুখে সে কবুল করিবে, করিয়া বিচার চাহিবে—যত বড় কঠিন শাস্তি দিন, বুক পাতিয়া সে গ্রহণ করিবে!

চা-সমেত চায়ের পেয়ালা টেবিলে পড়িয়া আছে। ছেলেরা আসিল। তাদের পড়াশুনা···

সুমিত্রা কহিল—আমার শরীর বড় খারাপ, আজ ক্লাশ নিতে পারবো না। তোমরা পড়ো নিজে নিজে ··

ছেলেরা সুমিত্রার মুখের পানে চাহিল। ও-মুখ তারা এমন মলিন পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই! তারা বিদায় লইল।

খবর পাইয়া সুহাস ছুটিয়া আসিলেন। তাঁর মুখে-চোখে উদ্বেগের ছায়া। সুহাস কহিলেন—কি হলো?

মৃদু কণ্ঠে সুমিত্রা কহিল,—এমন কিছু নয়। রাত্রে ভালো-ঘুম হয় নি, তাই কেমন···

সুহাস কহিলেন,—তাই বলুন। সময়টা খারাপ কি না—ভয় হয়েছিল।

মৃদু হাসিয়া সুমিত্রা কহিল—ভয়ের কারণ নেই। আপনি যান্।

সুহাস চলিয়া গেলেন। সুমিত্রা পথের পানে চাহিল; পরে ঘড়ির পানে। ঘড়ির ছোট কাঁটাটা আটটার ঘর পার হইয়াছে, ন'টার ঘর বুঝি এখনি ধরে! সুমিত্রা মুখ-হাত ধুইতে গেল।

সাফ হইয়া সে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। পথের পানে চাহিয়া রহিল। বড় বড় গাছগুলা ছায়া মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, বাতাসে পত্র-পল্লব মৃদু দুলিতেছে! চারিদিকে জীবনের স্পন্দন! দীপ্ত শ্রী!...তার মনেই শুধু এই সকালে ভয়ের ছম্‌ছমানি!

ঐ না...ঐ...কতকগুলা শুভ্র মূর্ত্তি? তাই!

সুমিত্রা চক্ষু মুদিল...একান্ত আগ্রহে ভগবানকে ডাকিল—O Father That art in Heaven...

সাহেব আসিলেন...সঙ্গে এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি। সুমিত্রা তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিল।

চারিদিক দেখিয়া সাহেব প্ল্যান খুলিলেন, বলিলেন,—ইনি শীঘ্রই কাজ সুরু করবেন। তুমি ওঁর হাতে টাকা দিয়ে যাও, সুমিত্রা। তিন মাসে উনি কাজ শেষ করে দেবেন।

সাহেবের মুখ সস্মিত।

এঞ্জিনিয়ার বাঙালী। হাসিয়া তিনি কহিলেন—আপনার কি সুখ্যাতিই যে সাহেব করছিলেন...বলছিলেন, she is an angel.

গাঢ় কণ্ঠে সুমিত্রা কহিল—টাকা আনি!

সে ঘরে ঢুকিল···সিন্দুক খুলিল। Miracle··· তেমন miracle ঘটে না?···মহাভারতে সে পড়িয়াছে, দ্রৌপদী নারায়ণকে ডাকিয়াছিলেন, তাঁর লজ্জা রক্ষার জন্য! নারায়ণ সে ডাক শুনিয়াছিলেন। তারও আজ দ্রৌপদীর দশা! বুঝি, দ্রৌপদীর চেয়েও বড় বিপদ! চোরের কাজ করিয়াছে সে। কত বড় কলঙ্ক! তাই সে ভাবিতেছিল, ভগবান কি তার ডাক শুনিবেন না? Miracle-এর সৃষ্টি করিবেন না?

বুকখানা নিমেষের জন্য স্পন্দিত হইল। কিন্তু কিছু ঘটিল না! কোথায় miracle?···টাকা গণিয়া যতবার দেখে, ততবারই কম হয়—সেই এক হাজার কম। তার নিজের সঞ্চয়? গণিয়া দেখে, তিনশো বত্রিশ টাকা! বাকী ছ'শো আটষট্টি টাকা চাই!···কোনো উপায় নাই? ভগবান···ভগবান, তোমার অসাধ্য কিছু নাই। তুমি মনে করিলে ··মান রাখো, মান রাখো, দুর্ব্বলচিত্তা নারীর মান-ইজ্জৎ রক্ষা করো প্রভু।

কে শুনিবে? মানুষের শয়তানীর পর শয়তানী দেখিয়া ভগবান আজ চোখ বুজিয়াছেন। তাঁর বিরক্তি ধরিয়াছে, ঘৃণা ধরিয়াছে, মানুষের ডাক তিনি তাই আর কাণে তোলেন না।

উপায়?

দুনিয়া দুলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ গাছপালা মাঠ-বাট··· মাথার উপর ঐ রৌদ্র-আলোকিত নীল নির্ম্মল আকাশও···

মনের মিল

উপায় আছে। একটিমাত্র উপায়! তাহাতে লজ্জা রক্ষা পাইবে—আর কিছু না হোক্!···সেই উপায়···

টেবিলের উপর টাকার থলি এবং বিজলীর হ্যাণ্ডনোট রাখিয়া সুমিত্রা পিছনের দ্বার-পথে বাহির হইয়া গেল···বুঝি। নিতাইয়ের সন্ধানে! তার গতি চোরের মত সতর্ক কম্পিত।

দীর্ঘ পথ। খোলা মাঠ, বন, জঙ্গল, ঝোপ-ঝাপ, পুকুর, ডোবা খানা, নালা···কদর্য্যতার সঙ্গে চারুতার বিচিত্র মিলন।···সুচিত্রার মনে হইল, শয়তানীর সঙ্গে করুণার মিলনের মত যেন!

কিন্তু নিতাইয়ের কাছে কেন সে চলিয়াছে? নিতাই কি করিবে? কেন করিবে?···কি বলিয়া সে-ই বা করুণা ভিক্ষ করিবে? বুকে তার তীব্র বহ্নি-দাহ! সে দাহে তীক্ষ্ণ জ্বালা!

সামনে পুকুর। বুকে কালো জল। ঢেউ তুলিয়া তাকে যেন ডাকিতেছে, তোমার ও-জ্বালা আমি জুড়াইয়া দিব। এসো, আমার বুকে এসো।

নিমেষের ইঙ্গিত! কাণের কাছে মনও কহিল—তাই চলো। সব কুৎসা, সব গ্লানি জুড়াইবে, চলো!

সুমিত্রা পুকুরে নামিল।···আঃ, কি শীতল জল! কি আশার উল্লাসে ভরা! কি স্নিগ্ধ আরাম এ জলে...

বিদ্যুতের চমক দিয়া দুনিয়ার আলো পরক্ষণেই দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল। সব অন্ধকার···দিকে দিকে কেবলি ঘন কালো অন্ধকার···



যখন সুমিত্রা চোখ মেলিল, ঘরে এক-ঘর লোক। সাহেব, এঞ্জিনিয়ার, সুহাস ডাক্তার আর নিতাই। নিতাইয়ের চোখে তীব্র আগ্রহ!

সাহেব কহিলেন—জলে ডুবলো কি করে?...ওদিকে গেল কখন?

নিতাই কহিল,—টাকা এখানে রাখা নিরাপদ নয় বলে আমার কাছে রেখেছিলেন। তারপর আমার কাছে যাচ্ছিলেন। পিছল পথ...পা হড়কে জলে পড়ে যান। ভাগ্যে আমি ঐ পথে আসছিলুম...

সাহেব কহিলেন—Thank God: And He never means harm to the good.

নিতাই কহিল—তাই।

সুমিত্রার লুপ্ত চেতনা ফিরাইতে বিলম্ব ঘটিল না। নিতাই খুব সময়ে এ পথে আসিয়াছিল।—সুমিত্রা জলে হাবুডুবু খাইতেছে—পথের ধারেই পুকুর। জল খুব বেশী নয়।

শুশ্রূষায়-সেবায় কলরবে সারাদিন কাটিয়া গেল। বৈকালে সাহেব সদলে বিদায় লইলেন।

তাঁদের বিদায় দিয়া নিতাই বারান্দায় আসিয়া বসিল।

সুমিত্রা দাঁড়াইয়াছিল। আকাশে একটা পাখী উড়িতেছে, সুমিত্রা তার পানে চাহিয়া আছে।

সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুমিত্রা কহিল—এত টাকা আপনি কেন দিলেন?

নিতাই কহিল—ও-কথা মুখে আনবেন না। টাকা এমনি পড়েছিল বৈ নয়! তবে বিজলীকে শিক্ষা যা দিয়েছি, তা তার হাড়ে হাড়ে গাঁথা থাকবে।...সকাল অবধি যখন কিছু আদায় হলো না, তখন বাড়ী ফিরে এসে টাকার জোগাড় করে ফেললুম।

সুমিত্রা কহিল—কিন্তু এ ঋণ...

নিতাই সুমিত্রার পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল,—দেবেন এর পর শুধে! তার জন্য চিন্তা কিসের?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

হাতী-ঘোড়ার পরে

আনন্দর দুঃখের সীমা নাই। কলিকাতায় থাকিবার সময় টগরকে লইয়া মনে রোমান্সের কত ছবি আঁকিত! কলেজে পড়ে···টেনিশনের এনক্ আর্ডেন···শক্ত প্যাশেজওলা বুঝিতে না পারিলেও গল্পের প্রেমটুকু ভালো করিয়া বুঝিয়াছে। সাহস করিয়া ভালোবাসার কথাটুকু শুধু বলিয়া ফেলা। বিশেষ নায়িকা যেখানে টগর! কেশব আজ বছর খানেকই না হয় টগরকে বিবাহ করিয়াছে···টগরকে কেশব জানে এই এক বছর!

কিন্তু আনন্দ?······

ছোট বেলায় টগরকে কত কি দিয়াছে···এবং যখনি তাকে ডাকিয়াছে, সে-ডাকে টগর সাড়া দিয়াছে।

টগর চন্দ্রশেখর পড়িতেছিল। এনক্ আর্ডেন পড়িয়া, বাঙলা নাটক নভেল পড়িয়া আনন্দ যদি নিজের মনের পরিচয় পাইয়া থাকে, তাহা হইলে টগরও কি তার মনের দারুণ দৈন্যের খবর ঐ সব নাটক-নভেল পড়িয়া পায় নাই? নিশ্চয় পাইয়াছে। নহিলে ঘর-কর্ণার কাজের মধ্যে একটু অবসর পাইলেই টগর নাটক-নভেল পড়িবে কেন? পাড়ায় টগরের বয়সী আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে এপাড়া ওপাড়া

এবাড়ী-ওবাড়ী ঘুরিয়া গল্প করিয়া তাস খেলিয়া বেড়াইতে পারিত। তা সে করে না এবং বাছিয়া বাছিয়া পড়িতেছে চন্দ্রশেখর!

শৈবলিনী আর প্রতাপকে লইয়া আনন্দ যে ইঙ্গিত করিয়াছে···তারপর ঐ নিজের লেখা পদ্য পড়ানো···রাগ হইল··· অমন নিরালা অবসর···পদ্যটা পড়িয়া সদ্য শেষ করিয়াছে··· ঐ পদ্য ধরিয়া মনের কথা পাড়িবে···আর ঠিক সেই সময়ে শশীদায় বৌঠকরুণ আসিয়া হাজির···

তারপর হইতে প্রত্যহ সুযোগ খুঁজিতেছে আর একবার অমনি একটু নিরালা···কিন্তু খটিতেছে না। কেশববে সে কেয়ার করে না···কেশব বাড়ীতে থাকিতে আনন্দ গিয়া টগরের সঙ্গে দেখা করিতে পারে। কেশব যদি বলে, কি খবর? আনন্দ বলিবে—টগরের কাছে একট দরকার। সন্দেহ করে যদি? করুক···সতুবাবুর ছেলে আনন্দ আর সতুবাবু কেশবের অন্নদাতা। কাজেই মনে সন্দেহ জাগিলেও সে-সন্দেহ মনে রাখিবে···প্রকাশ করিবার সাহস হইবে না! তা ছাড়া কেশব টগরের দাম বোঝে না—সে বিবাহ করিয়াছে সংসার-টাকে চালাইয়া কেশবকে নিশ্চিন্ত রাখিবে টগর—ব্যস! আনন্দও এখান হইতে টগরকে ছিনাইয়া লইয়া যাইতে চায় না··তার বিপদ ঐ ছেলেমেয়েগুলোর জন্য···বাড়ীতে ধরেনা এত ছেলে মেয়ে···কিলবিল করিতেছে পোকা মাকড়ের মতো! নিরালায় টগরকে ডাকিয়া পদ্য শুনাইয়া মনের কথা জানাইবে, সে ফাঁক মিলিবে না? আনন্দ ভাবে আর

ভাবে। এবং যখন পদ্য লিখিতে শিখিয়াছে তখন কল্পনার রথে তুলিয়া মনকে চৌদ্দভুবন ঘুরাইতে চায়···

ভাবিয়া ভাবিয়া পদ্যে সে একখানা চিঠি লিখিল টগরের নামে। ছন্দে গাঁথিয়া এ-কথা জানাইল যে চন্দ্রশেখরের মতো কেশবও তোমার যোগ্য নয়! জ্যোৎস্না-নিশীথে তোমাকে পাশে বসাইয়া কখনো প্রাণের কথা শুনাইয়াছে? প্রাণ কি তার আছে যে প্রাণের কথা শুনাইবে? ভাত-ডাল তো আছেই কিন্তু ভাত-ডালের প্রয়োজন মানুষের কতটুকু? পেটটা ভরানো শুধু! এমনি নানা কথা লিখিতে লিখিতে পদ্যের শেষের দিকে লিখিয়াছে—

আমি তোমার মনের খবর রাখি—
মনের দৈন্য দিই ভালোবাসায় ঢাকি।
জ্যোৎস্না রাতে কানে তোমার গাইবো গান,—
এসো তুমি প্রাণের প্রিয়া—বাঁচাও প্রাণ!
তুচ্ছ প্রতাপ ভালোবাসার জানতো কি?
তোমার পরে আমার এ প্রেম ঢের বেশী।
তুচ্ছ করি পৃথিবীকে হতে পারি সর্বত্যাগী
তুমি যদি হওগো টগর আমার
হৃদয় মন-ভাগী।

ক্যারারা হোয়ায়েট কাগজে বেশ পরিষ্কার করিয়া পদ্যটি লিখিয়া খামে মুড়িয়া খামে লিখিল—শ্রীমতী টগর প্রিয়তমাসু—লেফাফার মাথায় লিখিল গোপনীয়! এবং এক ফাঁকে টগরের সঙ্গে দেখাও হইয়া গেল। টগর গিয়াছিল সন্ধ্যার আগে

শশীর গৃহে…বিন্দু সেখানে মালপো তৈয়ার করিয়াছে… টগর ভালোবাসে…টগরকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল…তাই…

সেখান হইতে ফিরিতে একটু রাত হইল। টগর বাড়ী ফিরিতেছে…গ্রামের মেয়ে নিশ্চিন্ত মনে আসিতেছে…হঠাৎ আহ্বান—টগর…

চেনা গলা। টগর ফিরিল, বলিল,—আনন্দ!

—হুঁ…

আনন্দ আগাইয়া আসিল, বলিল,—একটা নতুন পদ্য… পড়াবো ভেবেছিলুম…কিন্তু তার সুযোগ মেলেনা। পড়বে?

—কেন পড়বো না?

—পড়ো। পড়ে কেমন লাগে লিখে আমায় একটু যদি জানাও…

—বেশ। কিন্তু কি করে পড়বো?

—এই নাও…

খামে আঁটা পদ্যর চিঠিখানা আনন্দ দিল টগরের হাতে… দিবার সময় টগরের হাতখানা আবেগভরে টিপিয়া ধরিল।

—আঃ! বলিয়া টগর হাত ছাড়াইয়া লইল।

একরাশ নিশ্বাস জমিল আনন্দর বুকে…তবু আনন্দ ডাকিল —টগর…

—বলো…

আনন্দ বলিল,—কাল সন্ধ্যার পর আসতে পারবে আমাদের খিড়কী পুকুরের ঘাটে?

—কেন ? টগর করিল প্রশ্ন···সহজ স্বর।

আনন্দ বলিল,—খুব ভালো চামেলি গাছ পুঁতেছি··· কলকাতার নার্শারি থেকে এনেছি···গোটা চারেক। তোমার যদি পছন্দ হয়···দু'টো নিয়ে আসবে।

ফুলগাছের উপর টগরের ভারী মায়া! টগর বলিল,—সত্যি?

—সত্যি···

—বেশ···যাবো।

টগর চলিয়া যাইতেছিল···আনন্দ ডাকিল—টগর···

—কেন?

আনন্দ চারিদিকে চাহিল···তার পর চাপা গলায় কণ্ঠে মিনতি ঢালিয়া বলিল,—একটা···

—ধেৎ! বলিয়া টগর চলিয়া গেল···গতিতে বেশ খানিকটা বেগ।

বাড়ী ফিরিয়া টগর পড়িল লেফাফা ছিঁড়িয়া আনন্দর লেখা পত্র! পড়িয়া শিহরিয়া উঠিল···বুঝিল, ভূতে পাইয়াছে আনন্দকে! ছি ছি···এ-সব কী কথা!

কিন্তু সতুবাবুর দয়ায় তাদের সংসার চলিতেছে···কিছু বলিবার জো নাই। তবু গাঁয়ে যে সব লোকের বাস···সতুর প্রসাদ বজায় রাখিবার জন্য ইহারা না করিতে পারে, এমন কাজ নাই!

তার উপর টগর শুনিয়াছে, শশীর বাড়ীতে বিন্দু বৌদিকে লইয়া চরণ ভট্টাচার্য্য কী মিথ্যা ঘোঁট পাকাইয়া তুলিয়াছে!

কে জানে, ঐ আনন্দ···ও তো সদু বাঁড়ুয্যের ছেলে···তাই বুকের জোর আছে···এখনই ব্যবস্থা না করিলে প্রশ্রয় পাইয়া যদি একদিন পথের উপর কি পুকুর-ঘাটে হাতখানা ধরিয়া বসে? টগর পুকুর সরিতে যায় সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা সব সময়ে··· কোনোদিন রাত নটাও বাজে···না, মজা বা তামাসার কথা নয় এ।

কিন্তু কি করা যায়? কেশবকে বলিবে? কেশব কি মানুষ! মাষ্টারী চাকরি বজায় রাখিবার জন্যই সংসারে পড়িয়া আছে! নিজের ছেলে-মেয়েগুলা যেন দুরন্ত ষাঁড় তৈরী হইতেছে···তাদেরই দাবিয়া রাখিতে পারে না। মমতা হইল! স্বামী বলিয়া মনে ধরে নাই সত্য—কিন্তু বিবাহ যখন হইয়াছে, তখন এ জন্মের মতো এ বন্ধন হইতে মুক্তি নাই তো।

এ-বন্ধন দেহে-মনে আঁটিয়া এ-জন্ম শোধ করিতে হইবে। নভেলে যে-সব কথা লেখে, ও-সব নভেলেই চলে, সত্যকার সংসারে তা না কি হয়? দশজনে ছি-ছি করিবে, তা ছাড়া ঐ নভেলেই পড়িয়াছে, পুরুষের এ-রকম ভালোবাসা···শুধু চোখের নেশা! পরের স্ত্রীকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে কত নভেলের কত মানুষ···কিন্তু দুদিন মাত্র মাথায় তুলিয়া নৃত্য করিয়াছে··· তারপর ছেঁড়া জুতার মতো ফেলিয়া দিয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণী···বিবাহের চেয়ে বড় নভেলের নায়িকা মালতী···সারা রাত টগরের চিন্তায় কাটিল।

রাত্রে কেশব দু-তিনবার করিয়া ওঠে···বয়সের ব্যাধি···

রাত তিনটা···কেশব দেখে···জানলার ধারে গুম হইয়া বসিয়া টগর···

কেশব বলিল—শোওনি ?

টগর বলিল,—না।

—অসুখ করেছে ?

—না। ঘুম হচ্ছে না।

কেশব ক্ষণেক দাঁড়াইল···টগর বলিল,—ঘুমোও গিয়ে··· সকালেই তো ছেলে পড়ানো···

কেশবের চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া আছে···কেশব গিয়া বিছানায় শুইল।

টগর নিশ্বাস ফেলিল। নাটক-নভেলে পড়া অনেকগুলা গল্প মনে ভাসিয়া উঠিল···প্রায় সব গল্পেই পড়িয়াছে, এমন ঘটিলে স্ত্রীকে স্বামী কী আদর করে··কত সোহাগে জাগ্রত স্ত্রীর চোখে ঘুম আনিয়া দেয়। কিন্তু কেশব ? ভাবিল, হায়রে, শুক্‌নো গাছে ফুলের প্রত্যাশা···বাতাসে প্রাসাদ-রচনা···

পরের দিন সকালে উঠিয়া টগর ছুটিল বিন্দুর কাছে। বিন্দু তখন শশীর জন্য মোহনভোগ তৈয়ার করিতেছে···শশী বলিয়াছে তার তাড়া আছে কোথায় কত কাজের আয়োজন করিতে হইবে।

টগরকে দেখিয়া বিন্দু বলিল—কিরে টগর ?

টগর বলিল—তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে বৌদি··· কাউকে বলবে না বল।

—কি কথা রে ?···বিন্দুর বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

টগর দেখাইল পদ্যে লেখা আনন্দর চিঠি।

বিন্দু পড়িল···পড়া শেষ হইলে বিন্দুর দু'চোখ হইল এত বড়···বিন্দু বলিল—টাকার জোর আছে বলে' আস্পর্দ্ধারও সীমা নেই! এ্যাঁ···এর বিহিত···

টগরের ভয় হইল, বলিল—কিন্তু বোঝো তো বৌদি···ওর বাবার স্কুল···আর সেই স্কুলে···

—তা বলে'···

—ভয় করে বৌদি। তাছাড়া একটা বদনাম দিতে কতক্ষণ!

বিন্দু বলিল—ঠাকুরপোকে বলি।

শশীদাকে···টগর চমকাইয়া উঠিল।

তোর ভয় নেই। আমার উপর কী পীড়ন চলেছিল জানিস তো। এ-সব সয়ে থাকলেই বিপদ। এ-রোগে সদ্য-সদ্য চাবুক দিতে হয়। তোর কোনো ভয় নেই···

শশীকে এ-কথা বলিলে, শশী চিঠি লইয়া নিতাইকে দেখাইল এবং সব কথা খুলিয়া বলিল।

নিতাই বলিল—হুঁ···লেখাপড়া শিখবে কি ও···দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ···প্রাণে বেজায় রস হয়েছে দেখছি···

শশী বলিল—কি করবে!

হাসিয়া নিতাই বলিল—আরে, এ তো একটা মশা··· এক চপেটাঘাতেই···হুঁ···

তবু শশী করিল প্রশ্ন।

নিতাই বলিল—ব্যস্ত হয়ো না···এখনি কিহিত করছি··· এসো আমার সঙ্গে ··

ভাগ্য প্রসন্ন···আনন্দ বেশভূষায় সাজিয়া বাহির হইয়াছে··· চলিয়াছে কেশবের স্কুলের দিকে···

নিতাই ডাকিল—আনন্দবাবু যে···নমস্কার!

কথার ভঙ্গীতে আনন্দ ভড়কাইয়া গেল। কোনো জবাব না দিয়া নিতাইয়ের পানে তাকাইল···

নিতাই বলিল—পদ্য লিখে ভালোবাসা জানাচ্ছো অপরের বিয়ে-করা স্ত্রীকে! এঁ্যা···এই সে পদ্য···তোমার বাবাকে দেখাবো···তারপর কোর্ট আছে···দুটো পয়সা আছে, তার জোরে বাঁচবে। গাঁয়ে কত কী করচো···কেউ কিছু বলে না··· ভেবেছো, গাঁ হলো ভারত-সাম্রাজ্য আর সে সাম্রাজ্যে তোমরা সম্রাট আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট!···এঁ্যা···

আনন্দর মুখ শুকাইয়া এতটুকুন···নিতাইয়ের গা জ্বলিয়া উঠিল। হাতও সেইসঙ্গে নিশপিশ···আনন্দর কাণ ধরিয়া নিতাই সবেগে দিল টান···মাথা হেলিয়া পড়িল···তারপর কাণ ছাড়িয়া তার গালে বেশ জোরে বসাইল চড়···কহিল,—ফের যদি ভদ্রলোকের বৌয়ের সঙ্গে প্রেম করতে যাও, শুনি···তাহলে পাঁজাকোলা করে' নিয়ে গিয়ে নদীর জলে চোবাবো···

আনন্দর বুক কাঁপিতেছে···কেহ যদি আসিয়া পড়ে···যদি প্রশ্ন করে, ব্যাপার কি? বাবা তাহা হইলে দূর করিয়া দিবে···

মুখে কথা নাই···মাথা নীচু করিয়া আছে আনন্দ···

নিতাই কহিল,—কী···এ প্রেম চলবে? না, এর সমাপ্তি··· বলো, যাবে থানায়?'

আনন্দ বলিল—না।

—কাণ মলো নিজের হাতে···বলো, কেশব ঠাকুরের বাড়ীর দিক্ মাড়াবে না, টগরকে কোনোরকম জ্বালাতন করবে না।

চারিদিকে চাহিয়া আনন্দ নিজের কাণ মলিল—বলিল, না, —আর কখনো না।

—হুঁ, মনে থাকে যেন! পদ্য লিখতে চাও, তোমার ঐ আকাশ আছে, বাতাস আছে···ফুল আছে, ফল আছে··· গরু বাছুর চাল ডাল···এত জিনিষ রয়েছে, সেইসব নিয়ে লেখো! তা নয়, পরের বৌয়ের উপর নজর! কথা শেষ করিয়া আনন্দর গালে আবার একটা চড় মারিয়া নিতাই বলিল, পদ্য আমার কাছে রইলো! ফের যদি শুনি···টগরকে দিক্ করেছো, তাহলে ছাড়বো না। টগরকে আদালতে নিয়ে গিয়ে, দেবো তাকে দিয়ে নালিশ ঠুকে···হুঁশিয়ার আনন্দ রায়···

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মনে-মনে

আনন্দকে টিট করিয়া নিতাই বলিল—চলো, স্কুলে যাই··· ওদের সভা বসবে বেলা দশটায়। আমরা নেহাৎ নিমন্ত্রিতের মতো যাবো···ভালো দেখাবে না শশীদা···

—হুঁ···মানে, ভয় পেয়ে টগর এসেছিল বৌদির কাছে সকালেই···বৌদি আমাকে চিঠি দেখালো, আমি ভাবলুম—এর বিহিতের জন্য দেরী করা নয়, তাই···

—বেশ। এখন তুমি তৈরী হয়ে এসো···আমিও তৈরী হয়ে নি। বেলা এখন আটটা···

স্কুলে আজ ভিত্তি-স্থাপনের উৎসব। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিবে এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে এদিককার মাতব্বর বহু লোক আসিবে। সদু বাঁড়ুয্যেকেও কার্ড পাঠানো হইয়াছে··· নিতাই বলিল,—মজা দেখো শশীদা···ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসচেন, কাজেই এরা স্কুলে দিব্যি আসবে'খন···এখানকার ধর্ম্মধ্বজগুলো···

ন'টার আগেই নিতাই আর শশী আসিয়া স্কুলে হাজির ···সুমিত্রা যেন দশভূজা হইয়া সব দিকে সব কাজে নিজেকে

সঁপিয়া দিয়াছে। পরিচ্ছন্ন পরিপাটী বেশ···সাদাসিধা··তাহাতে বাহার নাই··অথচ সম্ভ্রম সরমের পরিপাটী আবরণ। সকলের কাজে সস্নেহে সহযোগিতা···কপালে স্বেদবিন্দু···

নিতাইয়ের চোখে অপরূপ লাগিল।

নিতাই আর শশীকে দেখিয়া সুমিত্রা ছুটিয়া কাছে আসিল। সস্মিত হাস্যে বলিল—আপনাদের কাজ করতে হবে···

হাসিয়া নিতাই কহিল—কাজ করতেই তো এসেছি, নেমন্তন্ন খেতে আসিনি আমরা। আপনি আমাদের কী ইন্‌স্‌পায়ার করেছেন···মন্ত্র জানেন।

হাসিয়া সুমিত্রা বলিল—এসব কথা রেখে এখন যান ষ্টোরে, রমানাথবাবু আছেন। প্লেটে করে' খাবার সাজাচ্ছেন··· ও-ঘরে এখানকার কাকেও ঢুকতে দিইনি। জানি তো, জাত যাবার ভয়ে অনেকে কাঁটা হয়ে থাকেন!

হাসিয়া নিতাই বলিল—জাতকে যারা এত ঠুনকো ভাবে, পাশে বসলে জাত যাবে···বিস্কুট খেলে জাত যাবে···জাতের মর্ম্ম তারা বোঝেনা। তাছাড়া এখানে দেখবেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব থাকবেন, তাঁর সামনে জাতের বাঁধন অনেকের আল্‌গা হবে। তবু···যাক, যখন জাত বাঁচিয়ে খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছেন···ভালোই করেছেন।

সুমিত্রা বলিল—ওঁদের সামনে আপনারাই দয়া করে' খাবার পরিবেষণ করবেন···কেমন?

উৎসব চুকিতে বেলা বারোটা বাজিয়া গেল···মাতব্বরের দল সকলেই আসিয়াছিল—এখানকার সতু বাঁড়ুয্যেরাও ··

টেবিলে মাটির প্লেটে করিয়া খাবার। শশী, নিতাই, রমানাথ, তারিণী···এরা খাবারের প্লেট আনিয়া দিল···সতুর দল নিতাইকে ডাকিয়া একান্তে কহিল—ওরা ছোঁয়নি তো বাবা?

নিতাই বলিল—না, না। আপনারা যেখানে···রমানাথ আর তারিণী···এরা ছিল খাবারের চার্জে···

নিশ্বাস ফেলিয়া তাঁরা চুপ করিয়া গেলেন এবং খাওয়ার কোনো বিঘ্ন ঘটিল না!

বেলা একটায় লোকজন বিদায় হইল···চাঁদোয়া খাটানো লনে শুধু নিতাই, শশী আর সুমিত্রা···

সুমিত্রা বলিল—একটা সুসংবাদ আছে···

নিতাই বলিল—কি?

—রমানাথবাবুর চিঠি এসেছে···মাসে এখন তিরিশ টাকা করে' পাবেন···বাড়ী থেকেই আসা-যাওয়া করবেন।

শুনিয়া নিতাই খুশী হইল···বলিল—রমানাথবাবু পড়াতে যাবেন···

তারপর ইস্কুল সম্বন্ধে নানা কথা···বেলা দুটো বাজিল।

শশী বলিল—উঠি এবার···

নিতাই বলিল—তুমি এসো। আমার একটু দেরী হবে···

শশী বলিল—বৌদিকে নিয়ে ওবেলা আসবো।

সুমিত্রা বলিল—নিশ্চয়। কথা দেছেন···

শশী চলিয়া গেলে নিতাই বলিল—আমার একটু কথা আছে।

সুমিত্রা বলিল—বলুন···

নিতাই বলিল—শ'খানেক টাকা এনেছি। আপনাদের স্কুল-ফণ্ডে দিতে চাই···

সুমিত্রা বলিল—আপনার অনুগ্রহের আর সীমা নেই··· কিন্তু এঁরা থাকতে এ টাকা দিলেন না কেন?

—না, দামামা বাজিয়ে দিতে আমার লজ্জা করে···সে রুচিও নেই।

একশো টাকার একখানা নোট নিতাই দিল সুমিত্রার হাতে।

সুমিত্রা বলিল—এখনি এর রসিদ···অফিস-ঘরে আসবেন?

—রসিদের কি দরকার,

—ডিউটি। রসিদ ফেলে দিতে চান, দেবেন, কিন্তু রসিদ দরকার তো।

—বেশ। চলুন···

দুজনে আসিল অফিস-ঘরে। সেখানে রসিদ লেখা প্রভৃতি।

সুমিত্রা বলিল—আপনার সে টাকাটা···আমায় কী ঋণে ঋণী ক'রে রেখেছেন! ও টাকা শোধ না দেওয়া অবধি আমি স্বস্তি পাবো না···সত্যি···

একটা নিশ্বাস সুমিত্রা রোধ করিতে পারিল না।

সুমিত্রার পানে নিতাইয়ের একাগ্র দৃষ্টি···হাসিয়া নিতাই বলিল—এ ঋণের জন্য এত ভাবনা। কিন্তু শোধ করবার খুব সহজ উপায় তো রয়েছে।

সুমিত্রা চাহিল নিতাইয়ের পানে—কহিল—কি উপায়?

নিতাইয়ের বুকের কোথায় ছিল একখানা পাথর চাপা··· সে দৃষ্টিতে বুকের সে পাথর সরিয়া গেল···

দ্বিধাহীন কণ্ঠে নিতাই বলিল—আমি একটা ভ্যাগাবণ্ড ·· কাজকর্ম্ম করি না···শুয়ে-বসে' দিন কাটাই। আপনার কাজ আর আপনার মত···আমাকে কী-রকম যে ইন্‌স্পায়ার করেছে···যদি অনুমতি দেন···আপনার সঙ্গে এ-কাজে নামবার অধিকার···

সুমিত্রার দু'চোখে গভীর আবেশ···সুমিত্রা বলিল—আপনি কি বলছেন নিতাইবাবু···আপনাকে পাশে পেলে আমি কতখানি শক্তি পাবো···বলিতে-বলিতে নিতাইয়ের চোখে সুমিত্রা যে আবেশ লক্ষ্য করিল···নিতাই তার পানে চাহিয়া···সুমিত্রা কথা শেষ করিতে পারিল না···মাথা নীচু করিল।

নিতাই বলিল—তাই চাই···বলিয়া সুমিত্রার হাত নিজের হাতে ধরিল···সুমিত্রার দেহে বিদ্যুতের তরঙ্গ বহিয়া গেল··· মুখে গোলাপের আভা···নিতাই বিমুগ্ধ হইল।

চুপ করিয়া নিতাই চাহিয়া রহিল অনেকক্ষণ···সুমিত্রার মুখে নিবদ্ধ একাগ্র অবিচল দৃষ্টি···

তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া নিতাই বলিল—শয়তান

একটা কথা ঠিক বলেছিল···জীবনের পথে সাথী চাই, মনকে উদ্দীপ্ত রাখতে পারবে এমন সাথী।

সুমিত্রার মুখ ফুটিল। সে কহিল,—কিন্তু সে যোগ্যতা কি আমার আছে?

নিতাই চমকিয়া উঠিল। সে কহিল,—যোগ্যতা! আপনার যোগ্যতা! আমিই অযোগ্য···তাই মনের স্পর্দ্ধা···

সুমিত্রা কহিল,—ও কথা বলবেন না। আমি আপনার পায়ে চিরদিন বিকিয়ে রইলুম। কে আমি! অথচ কি দিয়ে আমার মান, আমার ইজ্জৎ আপনি রক্ষা করলেন! কিন্তু···আমার দেবার মতো কি আছে? তার উপর···

নিতাই সুমিত্রার হাত ধরিল, কহিল,—তার উপর কি?

সুমিত্রা কহিল,—আমি অনাথা। খৃষ্টানের ঘরে খৃষ্টানের অন্নে প্রতিপালিত···

নিতাই কহিল,—হিন্দু-খৃষ্টান···এ ভেদ মানুষের তৈরী। আমরা মানুষ···একই বিধাতার হাতে গড়া মানুষ। শুধু সঙ্কীর্ণ মন নিয়ে এই হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানের ভেদ রচে' মস্ত ব্যবধান গড়ে' তুলছি পরস্পরের মধ্যে! এ ভেদ আমরা মানবো না। মানুষে-মানুষে মনের-মিল চাই। সে মিল ঘটাতে পারলে পৃথিবী—সৃষ্টির সার্থকতায় ভরে' উঠবে। সেই সার্থকতা যাতে লাভ করতে পারি, আসুন, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের জীবন মিশিয়ে এক-লক্ষ্যে বইয়ে দি···

সুমিত্রা কহিল,—তাই হোক!

মনের মিল

তার স্বর মৃদু, কোমল। সে-স্বরে রাজ্যের মাধুরী আর আরাম! আর তার চোখের দৃষ্টি? আনন্দের আবেশে জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে!

শেষ

আমাদের পরবর্ত্তী পরম-উপভোগ্য উপন্যাস

সাহিত্য-সব্যসাচী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

জীবন-সঙ্গিনী

কুশলী হাতের প্লট,···যেমন বিচিত্র···বিবিধ চরিত্রের সঙ্গত-স্বাভাবিক বিকাশ-বিভবে তেমনি উপভোগ্য।

হাসি-অশ্রু-শ্লেষ-ব্যঙ্গ—সর্ব্বরসের সমন্বয়ে অভিনব!

সিনেমার ছবির ট্রেলারে বিচিত্র চিত্রাভাসে খণ্ড-দৃশ্যলীলায় যেমন পরবর্ত্তী ছবির পরিচয় দেওয়া হয়, ঠিক তেমনি ভাবেই আমাদের পরবর্ত্তী নূতন উপন্যাস সৌরীন্দ্রমোহনের 'জীবন-সঙ্গিনী'র নানা পৃষ্ঠা হইতে ছত্রাবলী উদ্ধৃত করিয়া তার পরিচয় দিতেছি পাঠক-পাঠিকাকে।

এ-প্রয়াস বাঙলায় এই প্রথম।


শ্রীগৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
দেব সাহিত্য কুটীর
২২/৫ বি, ঝামাপুকুর লেন

জীবন-সঙ্গিনী

কলকাতা সহর। বহুকালের বোনেদী ঘর। টাকা-কড়ি অনেকখানি অক্ষয় আছে।

পূর্ব্বপুরুষে কে বুঝি কোন্ নবাবের দাওয়ান ছিলেন, তাঁর দৌলতে বাংলা দেশে জমিদারী এবং মোহর-টোহর বিস্তর সংগ্রহ হয়েছে।...

পাঁজিতে হিন্দুর যতগুলো পূজো-পার্ব্বণ নির্ঘণ্ট করে' লেখা আছে, এ-বাড়ীতে তার কোনোটা বাদ যায় না। দোল-দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী পূজো—এ-সবে শুধু জ্ঞাতি-কুটুম্ব-সমাগম আর ভোজের ধূম নয়; নাচ-গান যাত্রা—এ-সব চলে' আসছে সেই সেকাল থেকে।...

*　　　　*　　　　*

কর্ত্তার আসনে এখন বিদ্যুৎ চৌধুরী...তাকে নিয়েই গল্প সুরু।

এম-এ পাশ করে' ইস্তক তার ঝোঁক বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টার হয়ে আসবে। ওটাতে তখন কশরৎ ছিল কম—তদ্বির অনেকখানি। সে তদ্বিরের সামর্থ্য বিদ্যুৎ চৌধুরীর বিলক্ষণ।

কিন্তু বাড়ীতে বিধবা মা...সনাতন আচার-বিচারে এমন তাঁর ভক্তি যে, ছেলের কথায় তিনি শিউরে ওঠেন। বলেন—

ভয় করে বাবা! আচার-না-মানার দরুণ এ-বংশে দু-দুবার যে অনর্থ ঘটে গেছে···বাড়ীতে ঠাকুর-দেবতা রয়েছেন···জাগ্রত বিগ্রহ! তার উপর মা মঙ্গল-চণ্ডী বিরাজ করছেন ঘটে··· এ-বাড়ীতে এতটুকু অনাচার—তাঁরা সহ্য করবেন না।···

* * *

সেই মা মারা যাবার পর তিনমাস স্বর সইলো না। বিদ্যুৎ চৌধুরী চললো বিলেত—পূর্ব্বপুরুষের বাঁধা বিধি-নিষেধ ঠেলে।

স্ত্রী উমার মুখ মলিন। উমা বলে—আমার জন্যে না হোক, খোকনের জন্যে তোমার মন কেমন করবে না?

বিদ্যুৎ হাসলো। হেসে বিদ্যুৎ বললে—মন-কেমন-করা নিয়ে কুয়োর মধ্যে বসে' থাকলে মনের একদিন অপমৃত্যু ঘটবে, উমা। পৃথিবী আজ সব আড়াল সরিয়ে আমাদের বুকের উপর এসেছে। তাকে ঠেলে যদি সরিয়ে দিতে চাই, গ্রহণ না করি, তাহলে বুক যাবে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে!

পৃথিবীর কোন খবর উমা রাখে না। সে-খবরে তার দরকার নেই। তার পৃথিবী একটুখানি—স্বামী আর খোকনকে নিয়ে। আর এ-বাড়ীর ঠাকুর-দেবতা··পূজো-পার্ব্বণ লোকজন নিয়ম-কানুন এবং আচার-সংস্কার হলো তার এ-পৃথিবীর প্রাচীর। এই প্রাচীরের গণ্ডীর মধ্যে উমার পৃথিবী আবদ্ধ। গণ্ডী ছোট বলে' উমার মনে কষ্ট হয় না। এ-গণ্ডীর মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসে তার কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য নেই···বাহিরের পৃথিবী রইলো কি গেল, তাতেও উমার কিছু এসে যায় না।···

উমা বাড়ীর নিত্যপূজার উদ্যোগ-আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত। বিদ্যুৎ রাগ করে। বলে—এত বলি, এ-সব কাজ আর কারো

হাতে দাও। বামুনের মেয়ে না হলে' যদি না হয়, বলচি তো, দেখে-শুনে পরম-নিষ্ঠাবতী একজন গরীব মেয়েছেলে রাখা চলে না? বিশ-পঁচিশ টাকা মাহিনা দেবে…খাওয়া-পরা-থাকা—যে শুধু পূজোর কাজ করবে। ব্যস্!

কুণ্ঠাভাবে উমা বলে—কিন্তু জানো তো, তোমাদের বাড়ী পূজোর কাজকর্ম্ম, নিয়ম-নিষ্ঠা…

* * *

মরবার সময় শ্বাশুড়ী উমার হাত ধরে' বার-বার সাবধান করে' গেছেন—এ-বাড়ীতে লক্ষ্মী অচলা হয়ে আছেন শুধু গৃহিণীর নিষ্ঠায়।…যে-সব আচার-বিচার আমি মেনে আসছি, তুমি সে-সব দেখেছো তো—সে-সবে যেন এতটুকু ত্রুটি না ঘটে! বিদ্যুৎ যদি না মানে, খাওয়া-দাওয়ায় অনাচার করে, বারমহলে করুক। ঠাকুরদের মহলে যেন তার বাতাস না লাগে, মা! জানো তো, আচার না মেনে এ-বংশে কত-বড় দুটো অনর্থ ঘটে গেছে একদিন!

একদিকে ঠাকুর-দেবতা, আচার-নিষ্ঠা, আর-একদিকে স্বামী বিদ্যুৎ! এমনি দোটানার মধ্যে উমা নিরালা অবসরে বসে' ভাবে…কোনো কূলই কি আমার থাকবে না ঠাকুর? বসে'-বসে' ভাবে…ভাবে আর নিশ্বাস ফ্যালে।…স্বামী বিদ্যুৎ দিনে-দিনে তার পাশ থেকে সরে-সরে' যাচ্ছে যেন!

* * *

চার বছর পরের কথা…

বিদ্যুৎ দেশে ফিরলো নতুন চোখ এবং সে-চোখে নতুন দৃষ্টি নিয়ে…

সুজন পিসতুতো ভাই। বয়সে ছোট। পায়ের ধূলো নিতে

হাত বাড়ালো—দেশের যেমন প্রথা। বিদ্যুৎ পা নিলে সরিয়ে; বললে—হোয়াই মেক এ ফুল অফ্ ইয়োরশেল্ফ !...তাছাড়া, পা পাবে কোথায়? পা নেই! পায়ে জুতো। জুতোর ধূলো নেবার প্রথা তোমাদের শাস্ত্রের কোনো পাতায় লেখা নেই!

সুজন বলে—চোখ দুটো সোনার জলে ধুয়ে নাও বিদ্দা... ওখানকার চুরুটের ধোঁয়ায় আর ফগ্-এ তোমার চোখ আচ্ছন্ন রয়েছে...সোনার জলে সে ধোঁয়া-ফগ্ ধুয়ে-মুছে দেশকে ছাখো। ভালো লাগবে, খুশী হবে...

বসে' সিগার ধরিয়ে বিদ্যুৎ বলে—বাঙালী-পাড়াটা একবার দেখে এলুম, সুজন। মেয়েরা চলেছে দল-বেঁধে...হাউ ক্লামশী! এখনো এ-যুগে ঘোমটা!...মাথার উপর আকাশে এরোপ্লেনে চড়ে' যেন ডন্ জুয়ানের দল ঘুর্ছে—ওঁদের মুখ দেখতে পেলে চিলের মত ছোঁ মেরে লুঠে নিয়ে যাবে! এঁ্যা? কি সব ভাবে?...

বিদ্যুৎ আরো বলে—এই ড্রিঙ্ক...মদ বলে' তোমরা ঘৃণা করো। ড্রিঙ্ক যে করে, তাকে মাতাল বলে' নাক সেঁটকাও! অথচ এই ড্রিঙ্ক...বিলেতে এ নিয়ে কারও কপাল কোঁচকায় না!

সুজন বলে—যস্মিন দেশে যদাচার...ওদেশের মানুষ এর ব্যবহার জানে। আমরা একটু খেয়ে খুশী হই না, বোতল-বোতল পার করি। তার ফলে ব্যারাম, চীৎকার, লিভার-এ্যাব্সেশ ...কাজ নষ্ট...সম্পত্তি ছারখার...বেপরোয়া দুশ্চরিত্রতা...কী না হচ্ছে, বলো তো? আমাদের দেশের বোনেদী পরিবারগুলোর বেশীর ভাগ তো ডুবে তলিয়ে গেল শুধু এই মদের বোতলে!...

সুজন বলে—বাড়ীখানার হাল করেছো যেন হরগৌরী!

হেসে বিদ্যুৎ দেয় জবাব—তা নয়, বলো বরং, বার-বাড়ীটা ওয়েষ্টার্ণ হেমিস্‌ফীয়ার পরিষ্কার ছিমছাম···আর অন্দর ইষ্টার্ণ হেমিস্‌ফীয়ার···এঁটো পাতা, মাছের আঁশ, হৈ-হৈ! যেন পাণ্ডেমোনিয়াম! জানো তো, ইষ্ট এ্যাণ্ড ওয়েষ্ট···দে নেভার মীট!

ফোন্ বাজে। জিতু ফোন্ করছে। জিতু বললে—তুমি বিলেত থেকে ফিরেছো···তোমার এ্যাট হোম···আমাদের ক্লাবে আসতে চাও তুমি। ফ্যাশনেব্‌ল্ গ্যাদারিং।

বিদ্যুৎ বলে—নিশ্চয় যাবো।

সুজন বললে—ওদের ক্লাব আছে···দী বোহেমিয়ান্স··· বিলেতে না গিয়ে বিলিতি আদব-কায়দা এমন রপ্ত করছে যে, দেখে, বিলিতি-মানুষও লজ্জা পায়!

*

জিতুর বাগান। লনে মস্ত আসর। ভাড়া-করা বেণ্ট-উড চেয়ারে আর ছোট-ছোট গোল টেবিলে আসরে ফাঁক নেই। উদ্দিপরা খানশামাদের ছুটোছুটি···প্লেটে-ডিশে-গ্লাসে-কাঁটায়-চামচে উঠছে ঝিনঝিনি-কিনকিনি 'রব। এক-এক টেবিলে এক-এক গ্রূপ, পান-ভোজ, হাসি হল্লা···

বিগ-গ্রূপ বসেছে, মলি সেনকে ঘিরে। সে গ্রূপে মলি সেনের পাশে বিদ্যুৎ চৌধুরী আর আছে স্মার্ট ছোকরা, বিজলী ব্যানার্জ্জী,···জিতু···এবং আরো দু'জন। বিজলী স্মার্ট ক্লেভার। বামুনের ছেলে জুতোর দোকান খুলেছে। শুনে বিদ্যুৎ মহাখুশী। তারিফ করে' বললে—এই তো চাই! বিজ্‌নেশ ইজ বিজ্‌নেশ। গলায় পৈতে দিলেই রুটি-বিস্কুট বেচতে হবে? কটা পয়সা

তাতে মিলবে? তার চেয়ে বহুৎ-বহুৎ লাভ জুতোর ব্যবসাতে!...

মলি সেনের সঙ্গে কথা হচ্ছে বিদ্যুতের। বিদ্যুৎ বললে—সেখানকার সোসাইটিতে আপনি চমৎকার ফিট্ করবেন! সিয়োর!

সলজ্জ মৃদুহাস্যে মলি বললে—আমার ইচ্ছা আছে...এ-বছরে সুবিধা হবে না, নেক্সট্ ইয়ারে মে-জুন নাগাদ...

জিতু বললে—টু মেক্ এ কনকোয়েষ্ট? তোমার নাচের ডিসপ্লে দেখিয়ে...

মলি বললে—নাচ...নাচ...নাচ আমার প্রাণ! নাচ নিয়ে আমি মেতে আছি। কিন্তু টু মেক ট্রেড অন্ ডান্স...আই হেট্ ইট।

বিদ্যুৎ বললে—কেন? আনা পাবলোভার মতো আর্টিষ্ট যদি...

বাধা দিয়ে মলি বললে,—আমি যত গরীরই হই না, আর্ট নিয়ে ব্যবসা, নেভার...নো...

* * *

রাত্রি। ঘড়িতে ঢং ঢং করে' দশটা বাজলো। উমা চমকে উঠলো!

বিদ্যুৎ এখনো ফেরেনি।

...কতক্ষণ খেয়াল নেই...বসে' আছে উমা। উমার মন বার-মহলে ঘোরাফেরা করছে। তার ওদিকে কি, উমা জানে না। হঠাৎ নীচে গাড়ী-বারান্দায় মোটরের হর্ণ...

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ...উমা এলো সিঁড়ির সামনে ল্যাণ্ডিংয়ে। সেখানে দু'জনে দেখা।

উমা বললে—খেয়ে এসেছো বুঝি?

—হ্যাঁ। পার্টি ছিল।

...ও!

বিদ্যুৎ বললে—তোমার এখনো খাওয়া হয়নি, নিশ্চয়?

উমা বললে—তোমার খাবার আগে কখনো আমি খাই ?

বিদ্যুৎ বললে—হুঁ। সতী-সাবিত্রীও শুনেছি তাই করতেন …না ? তবু তুমি আমার সঙ্গে খাওনা ! আমি খাই বাইরে টেবিলে। তুমি খাও ভিতরে…মেঝেয় আসনে বসে' থালা পেতে। কবে তুমি মানুষ হবে, উমা ?

এমনিভাবেই সম্ভাষণ। বিদ্যুৎ রাগ করে…বলে,—আমি কী চাই, তুমি তা কখনো বুঝবে না ? ‥

*　　*　　*

ছেলে ভানু…ছ-সাত বছর বয়স।

রাত্রে বিছানায় শোবে…মা উমা তার জামা-কাপড় ছাড়াচ্ছে। ভানু বললে—বাবা বলেছে, আমাকে বিলেতে পাঠিয়ে দেবে, জানো মা ?

উমা বললে—আমাকে ছেড়ে সেখানে থাকতে পারবে ?

ছেলে বললে—বা রে, আমি তো এখন বিলেত যাবো না। বড় হলে'…যখন বাবার মতন বড় হবো। বড় হলে' মাকে আর দরকার হবে না তো, তখন যাবো।

মা বললে—বড় হলে' মাকে দরকার হবে না কেন ?

—তখন নিজে-নিজে জামা-কাপড় পরবো…নিজে বিছানায় শোবো, কাছে কেউ না থাকলে ভয় করবে না। যখনি খিদে পাবে, খাবো।

উমা বললে—বটে, তাই মাকে বিলেত নিয়ে যাবে না ?

ছেলের বুঝি মমতা হলো ! ছেলে বললে—না, তা নয়… তুমিও আমার সঙ্গে বিলেত যাবে।

—মায়েরা বিলেত যায় না, ভানু।

ছেলের ভারী আশ্চর্য্য লাগলো! ভানু বললে,—কেন? বিলেতের লোকদের মা নেই বুঝি?

হেসে উমা বললে—তা নয়! বিলেত হলো, সাহেবদের দেশ। সেখানকার সাহেবদের মা হলো, মেম-সাহেব।

ভানু কোনো জবাব দিলে না।

কাপড় বদলানো হলো, উমা বললে—তুমি তাহলে বিলেত যাবে ভানু? তোমার খুব ইচ্ছে, না?

ভানু বললে—তা কেন? বাবা যে বলে। বাবা বলে, বিলেত গেলে কত কি দেখবো, কত কি শিখবো। বিলেত গেলে মানুষের মত মানুষ হবো।

উমা বললে—এদেশে থেকেও মানুষের মত মানুষ হওয়া যায় ভানু। মানুষ হবার জন্যে এদেশের মানুষকে বিলেত যেতে হয় না।

—তাই না কি? তাহলে আমি বিলেত যাবো না, মা। তুমি আমার সঙ্গে যাবে না···তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না, যেতে চাই না মা, আমার খুব মন কেমন করবে।

* * *

কোর্টের পর বাড়ীতে কি আরাম? বিদ্যুৎ উঠলো গিয়ে মলির ফ্লাটে। একটি কথা···একটু হাসি···কার কাছে পাবে? মলিকে মনে পড়লো। হাউ স্মার্ট···হাউ সোশাল!

মলি বললে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো মিষ্টার চৌধুরী?

—স্বচ্ছন্দে।

মলি বললে—মিসেস্ চৌধুরীকে নিয়ে আপনি তো কখনো বাইরে বেরোন না! সব সময়ে দেখি একা-একা। কেন? কাফে—পার্টি—সিনেমা···

বিদ্যুৎ বললে,—মানে, মিস্ সেন, আমাদের ফ্যামিলি হলো বহুকালের পুরোনো…যাকে বলে, বোনেদী। বাড়ীতে আগাগোড়া সেকেলে বোনেদী ভাব। প্রায় সেই পৌরাণিক-যুগের মত! আমার স্ত্রীর শিক্ষা-দীক্ষা মায়ের কাছে, সেইজন্যে তিনি সেকেলে রয়ে গেছেন। পুরুষ-মানুষ দেখলে জড়োসড়ো হন। মুখে ঘোমটা টানেন।

—স্ত্রীকে বুঝিয়ে আপনি…

—ঢের চেষ্টা করেছি মিস্ সেন…এবং করছিও। কিন্তু হোপলেশ্ টাস্ক!

করুণ-কণ্ঠে মলি বললে,—ও, হাউ আই ফীল ফর ইউ। সব থেকেও আপনার কিছু নেই তাহলে!

বিদ্যুৎ বিমুগ্ধ! তার উপর মলির এত দরদ!

মলি বললে—আপনি এত ভালো, বাট সো লোন্‌লি! আপনার স্ত্রী আপনাকে চিন্‌লো না! কি করে' এ ব্যথা আপনি সহ্য করচেন? আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমি যদি পারতুম…

কথাগুলো ছাড়াছাড়া…যেন হেঁয়ালি! তবু আভাসে যেটুকু অর্থ পাওয়া যায়…

দুর্বার লোভ!…একটা নিশ্বাস বিদ্যুৎ রোধ করতে পারলো না।

মলি এলো বিদ্যুতের কাছে—একেবারে পায়ের কাছে বসে' পড়লো…বললে,—নিশ্বাস ফেললেন যে?

বিদ্যুৎ বললে—আমার দুঃখ তুমি বোঝো?

নিশ্বাস ফেলে উদাস-কণ্ঠে মলি বললে—বুঝি।

—যদি সত্যি বোঝো আমার দুঃখ দুঃসহ, পারো আমার এ দুঃখ দূর করতে?

—কি করে’? মলির দু-চোখের দৃষ্টিতে আগ্রহ…আবেশ!

বিদ্যুৎ বললে,—বলবো, রাগ করবে না?

—না।

বিদ্যুৎ বললে,—তুমি আমার হও। পারো না? হোয়াই লেট্ আস্ ম্যারি।

*　　　*　　　*

মলির পানে চেয়ে উমার চোখে পলক পড়ে না। মলির মজা লাগলো। মলি বললে,—কি দেখছেন?

উমার মুখে কথা নেই। সে যেন কোন্ ধ্যানলোকে!

মলি বললে—আমি কে জানেন?

মৃদু হেসে মাথা নেড়ে উমা বললে—জানি।

—কে বলুন তো?

শান্ত-কণ্ঠে উমা বললে—বোন।

মলি হো-হো ক’রে হেসে উঠলো। বললে,—হাউ ফানি! আমাকে দেখে রাগ হচ্ছে না? জেলশি?

ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে উমা বললে—না। তোমাকে উনি দেখে পছন্দ করে’ এনেছেন! আমি ওঁকে সুখী করতে পারলুম না, তুমি করো।

মলি বললে—কিন্তু, আপনার নিজের সুখ?

উমা বললে,—দুদিন স্বামী-সুখে সুখী হও, তখন বুঝবে, মেয়েদের সুখ কিসে!

বিদ্যুৎ বললে,—এসো মলি, উমাকে আটকে রেখো না। ওঁর বোধহয় পূজোটুজোর কাজ বাকী।

*　　　*　　　*

মলি বললে,—কাকে ফোন করছিস ?

রেবা বললে—বাবু জয়রাম বক্সী।

—সে আবার ফোন্ নিলে কবে ?

—তাকে দিয়ে ফোন নিইয়েছি। বলছি, ফোন নেই, কখন কি কথা মনে হয়, আপনাকে বলতে চাই, আপনাকে বলবো··· ফোন্ না থাকলে কি করে' কথা হবে ?

হেসে মলি বললে—কেন রেবা, বুড়ো পেটো-কারবারীর মাথা খাচ্ছিস !

রেবা বললে—খাবো কী মলিদি ? ওর কি মাথা আছে—না, খাবার মতো মাথা ? একেবারে গোবর-পোরা ! নাহ'লে এমন করে' নাচে ! লোকে যেমন বাঁদর-নাচ দেখে, দেখি।

*   *   *

বিন্দু-ঝির সহ্য হয় না। উমাকে বললে,—কিছু বলি না, তুমি বকবে বলে' তাই বলিনি। নাহ'লে দেখেছি তো, ওদিকে গেলে ছেলেটাকে হাঁ-হাঁ করে' তেড়ে আসে, যেন তাড়কা রাক্ষসী ! কেন রে···যার সব, সে যাবে ভেসে ? তোরা তো উড়ে এসে জুড়ে বসেছিস !

—চুপ কর্ বিন্দু।

*   *   *

বিদ্যুৎ জিজ্ঞাসা করলে—ব্যাপার কি ব্যানার্জ্জী ?

মলি বললে—কিছু নয় ! বিন্দুর সঙ্গে কি বুঝি বকাবকি, মানে, মিস-আণ্ডারষ্টাণ্ডিং ? তা নিয়ে তুমি আর মাথা ঘামিয়ো না। এসো, আমাদের রিহার্শাল দেখবে।

বিদ্যুৎ বললে—না, না···মিষ্টার ব্যানার্জ্জী চুপ করে' আছেন !

বিজলী বললে—আজ্ঞে না, কিছু না।

বিদ্যুৎ বললে—আমায় বলো, কি নিয়ে এখনি দু'জনে···

মলি বললে—বিন্দু ওকে চোখ রাঙিয়ে কুকথা বলেছে।

—হুঁ! বিদ্যুৎ বললে···আচ্ছা, আমি এখনি আসছি।

* * *

গম্ভীর-কণ্ঠে বিদ্যুৎ বললে—হয় বিন্দু···না হয় আমি।··· একজনকে এ বাড়ী থেকে চলে' যেতে হবে।

উমা বললে,—বিন্দুর খুব অন্যায়, আমি তাকে খুব বকেছি।

বিদ্যুৎ বললে—মানুষ বাড়ীতে শান্তিতে থাকবে, তার উপায় নেই?

উমা বললে—তুমি যাতে শান্তি পাও, সে ব্যবস্থা আমি করবো।

* * *

বিন্দুর মুখে কথা বাধে না। বিন্দু বললে,—রাজলক্ষ্মী হয়ে নিজেকে তুমি এমনি বিসর্জ্জন দেবে?

মলিন হাস্যে উমা বললে,—আমার বিসর্জ্জন অনেক দিন আগে হয়ে গেছে বিন্দু।

* * *

মলি বললে—খবর পেলে?

নিশ্বাস ফেলে বিদ্যুৎ বললে—না। বিছানায় এই চিঠিখানা শুধু···

মলির হাতে বিদ্যুৎ দিলে চিঠি। মলি চিঠি পড়লো।

মলি বললে—তাহলে ভাবচো কেন? ওর মায়ের কাছে গেছে। মায়ের বাড়ী কোথায়?

—কাশীতে থাকেন উমার মা—আমার শাশুড়ী।

* * *

বেশ কঠিন-কণ্ঠে বিদ্যুৎ বললে—তোমাকে আমি ভদ্রলোক বলে' জানতুম বিজলী।

বিজলী কোনো জবাব দিলে না। মলি তাকালো উগ্রনয়নে বিদ্যুতের পানে।

বিদ্যুৎ বললে—মিসেস চৌধুরী আমার স্ত্রী।...তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে নেশার ঘোরে এইসব কথা বলচো তাঁকে! তোমাকে... তোমাকে...তোমাকে আমি...

বলতে-বলতে হাত নিশপিশ করে' উঠলো। বিজলীর ঘাড়খানা জোরে চেপে ধরলো বিদ্যুৎ...ধরে' তাকে ঠেলা দিয়ে বিদ্যুৎ বললে—এখনি বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে...নেভার টু এনটার মাই গেট্‌স্ এগেন!

* * *

বিদ্যুৎ বললে—তুমি জানো, বিজলী একটা লোফার র‍্যাস্কাল ...তার সঙ্গে তুমি সিনেমায় যাবে না!

মলি বললে—আমি যাবো। তুমি রুখবে? দেখি কেমন রুখতে পারো! আমি তোমার উমা নই যে, তোমাকে দেবতা ভেবে তোমার সব কথা মেনে চলবো? আমি মলি, এ-কথা ভুলে যেয়ো না।

* * *

ভানুকে ভালো করে' পরীক্ষা করে' ডাক্তারবাবু নিশ্বাস ফেললেন। তাঁর মুখ গম্ভীর।

দেখে রাখাল বললে—অসুখটা শক্ত?

তিনি বললেন—হুঁ।

—কি অসুখ?

ডাক্তার বললেন—নিউমোনিয়া। লাঙসে প্যাচ। আপনি কাগজ-কলম নিয়ে বাহিরে আসুন।

*   *   *

মার্কেট···একরাশ জিনিষ কিনে মলি মোটরে উঠবে···সামনে বিজলী।

বিজলী বললে—মিষ্টার চৌধুরীর খুব অসুখ নাকি? রঙপুরের কী সেশন্স-কেস্ করতে গিয়েছিলেন···কোর্টে অজ্ঞান হয়ে পড়ে' যান! কাগজে খবর পড়লুম।

মলি বললে—হঁ্যা।

—এখন কেমন আছেন?

—খুব জ্বর···বেহুঁশপানা। কিছু বলা যায় না।

বিজলী বললে—আর তুমি শপিং করতে বেরিয়েছ?

মলি বললে—আমাকেও রোগী হয়ে পড়ে' থাকতে হবে তাঁর সঙ্গে? দু-দুজন ইউরোপীয়ান নার্শ আছে! পাঁচজন ডাক্তার আসছেন। চিকিৎসা হচ্ছে, সেবা হচ্ছে।···একলা কেমন ভালো লাগলো না, তাই বেরিয়েছি।

বিজলী বললে—এখন বাড়ী ফিরচো?

—তাছাড়া আর জায়গা কোথায়?

বিজলী কি ভাবলো! বললে—সিনেমায় চলো না···ইভনিং শো···ভালো ছবি আছে।

—চলো।

—তার মানে, কোনো হোটেলে খাওয়াবে তো?

—হুঁ।

*   *   *

বিছানায় পড়ে' বিদ্যুৎ···

সুজন বললে—বৌদিকে একখানা চিঠি লিখবো বিদ্‌দা, কাশীতে ?

—না।

—না—কেন ?

—উমা কেন চলে' গেল সুজন ? উমাকে আমি কোনো দিন বলিনি, যাও !

সুজন বললে—হয়তো তারপর এখানে তাঁর থাকা কোনো কারণে সম্ভব হলো না। তা যাক, তোমার অসুখ শুনলে তিনি মনে অভিমান রাখবেন না···তখনি ছুটে আসবেন।

—হুঁ ! বিদ্যুৎ কি ভাবলো। তারপর বললে—ছোটবেলায় বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ পড়েছিলুম, সুজন। বিষবৃক্ষের সূর্য্যমুখী চলে' গিয়েছিল।

—কিন্তু সে সূর্য্যমুখী আবার ফিরে এসেছিল বিদ্‌দা !

—হুঁ ! একটা নিশ্বাস। বিদ্যুৎ বললে—নভেলের সূর্য্যমুখী ···তাই ফিরে এসেছিল। সত্যিকারের সূর্য্যমুখী চলে' গেলে আর ফিরে আসে না···

ঘটনার পর এইরকম বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি একসঙ্গে গেঁথে-গেঁথে লেখক যে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন সম্পূর্ণ বইখানিতে—ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তা একনিশ্বাসে পড়ে' যেতে হবে পাঠক-পাঠিকাকে···